স্বপ্ন-কোরক
দক্ষিণারঞ্জন বসু

স্বপ্ন-কোরক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৬১

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা আর্ট প্রেস

১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং

মুদ্রণ

দি নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই

এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম দু'টাকা

3749

স্বপ্ন-কোরক

ফিক্ করে হেসে ফেলে কৌশল্যা।

অমাবস্যার রাত্রিতে বিদ্যুতের এক ঝলক আলোর বিচ্ছুরণ যেন। মিশমিশে কালো শুক্‌নো মুখখানা দু'পাটি শাদা ধবধবে দাঁতের স্বচ্ছতায় সত্যিসত্যি চক্‌চক্ করে ওঠে।

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন সুমিত্রা সেন আর বন্দনা সান্যাল। প্রথম জন শিক্ষিকা, অপর জন সাহিত্যিকা।

ওদের মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নে কৌশল্যার এমনি প্রাণখোলা সলজ্জ হাসির বহর দেখে।

ছোট্ট প্রশ্নটি এমন কিছুই নয় যাতে এতো হাসি বা এতো লজ্জার কোন কারণ দেখা দিতে পারে।

ঃ তোমার স্বামী আছে?—সুমিত্রা দেবীর শুধুমাত্র এই সামান্য জিজ্ঞাসায় কৌশল্যা হাসিতে একেবারে ভেঙেই পড়ে যেন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কালো শাড়ির আঁচলে আপনাকে লুকিয়ে রাখতে চায় সে।

ঃ স্বামীর কথায় এতো লজ্জা কিসের?—অবাক হয়ে এবার প্রশ্ন করেন বন্দনা দেবী।

ঃ শুধু কি লজ্জাই দেখছো তুমি? আনন্দও কি কম, দেখছো না কেমন মিষ্টি হাসি?—বন্দনার কথার উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন আসে সুমিত্রার দিক থেকে।

কংকালসার বিষাদমলিন কৌশল্যার দিকে সবার আগেই কিন্তু

চোখ পড়েছিল বন্দনার। পাঁচমাধোর নয়া চাষীপল্লী দল বেঁধে দেখতে এসে সবাই যখন এদিক সেদিক ঘুরছে ফিরছে বন্দনা দেবী তখন কৌশল্যাকে নিয়েই ব্যস্ত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোনটার উত্তর মেলে কথায়, আবার কোনটার উত্তর হাসিতেই বুঝে নিতে হয়। বাংলা কথা মোটামুটি বুঝতে পারলেও কোন প্রশ্নেরই জবাব বাংলায় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা কৌশল্যার পক্ষে। আর তার ভাষাও এমনি দেহাতী হিন্দী যে অন্তত দু'তিন বারের চেষ্টায় তার মর্মোদ্ধার করতে হচ্ছে বন্দনা দেবীকে।

হঠাৎ তাঁর কখন যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বন্দনার সঙ্গে স্থমিত্রার তা' খেয়ালই নেই।

পাঁচমাধোতে নতুন বুনিয়াদী বিদ্যালয় বসেছে ক'মাস আগে। নতুন গ্রাম। নতুন তার সব কিছুই। তিলাইয়া বাঁধের জন্যে চার গাঁয়ের লোককে উৎখাত করতে হয়েছে এবং সে সব উদ্বাস্তুদেরই জন্যে পাঁচমাধোর পত্তন। পরিত্যক্ত চারটি গ্রামের আদ্য অক্ষর নিয়েই তো এই নতুন গাঁয়ের নাম। নতুন রামসীতা মন্দিরের সামনেই একতলা পাকা বিদ্যালয় ভবন। বেশ সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন বাড়ি। মাঝারি রকমের একটি ঘরে ইস্কুলের সব জিনিষপত্র। আর তারই সামনে রেলিং ঘেরা একটি বড় 'হলে' দল বেঁধে বাচ্চাদের মাদুর পেতে বসে পড়ার ব্যবস্থা।

সকালের ইস্কুল। তখনো ছুটি হয়নি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুর করে স্বদেশ-বন্দনা গাইতে গাইতে তক্‌লীতে সূতো কাটছে। তাদেরই সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় শিক্ষক তন্ময় হয়ে শুনছেন সে গান আর তক্‌লী কাটার একটানা ধ্বনি।

শীতের সকালের কুয়াসাঘেরা পাঁচমাধোর এই অপূর্ব পরিবেশে উপস্থিত হয়েই সবারই প্রথম নজরে পড়েছে এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান শুনতে আর সূতো কাটা দেখতে সবাই যেয়ে খোলা ইস্কুল বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারদিকে। আর সকলের সঙ্গে বন্দনা দেবীও সেখানেই গিয়ে প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরও বেশ ভালোই লাগছিলো সে পরিবেশ। কিন্তু কখন যে দলের কার কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি চাষীদের ঘর দেখতে কৌশল্যাদের বাড়িতে এসে ঢুকেছেন সে কথা তাঁরও ঠিক স্মরণ নেই।

হঠাৎ 'গান্ধী মহাত্মা কি জয়' ধ্বনি করে ছেলেমেয়েরা সব উঠে পড়ে তকলী রেখে। স্বদেশ-বন্দনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্কুলেরও ছুটি। সমবেত আনন্দ-কলরবের মধ্যে ইস্কুল থেকে যেই বেরিয়ে আসে মানবকের দল, সুমিত্রা দেবীও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে বন্দনা দেবী তাঁকে ছেড়ে কোথায় যেন আগেই চলে গেছেন। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়েও কোথাও হদিস পাওয়া যায় না তাঁর। বাইরে আর তাঁকে খুঁজে কোনই লাভ নেই। সুমিত্রাও তাই এগিয়ে চলেন আর সকলের সঙ্গে।

সুমিত্রা শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ের আকর্ষণ তাঁর বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ছুটি না হওয়া পর্যন্ত ইস্কুলের ধারেই দাঁড়িয়ে তিনি ছোটদের লক্ষ্য করছিলেন একমনে।

পরিদর্শকদের ছোট ছোট এক একটি দল বাড়ি বাড়ি যেয়ে খোঁজ খবর করেছে চাষীদের অবস্থার।

বুড়ো চাষী শুকদেও মাঠের কাজে অশক্ত হয়ে পড়েছে ভুগে ভুগে। সে বাড়িতেই থাকে। ভোর হতেই ঘরের দাওয়ায় এসে বসে। তামাক খায় মাঝে মাঝে, আর অতীত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। সারাদিন খেটে খুটে ছেলে সহদেও যা রুজিরোজগার করে আনে তাতে কি আর তিন তিনটে পেট চলে? ছেলেটা নেহাৎ ভালো বলেই এ অবস্থার মধ্যেও বুড়ো বাপের খেজমৎ করতে কসুর করে না কোন। কিন্তু শুকদেও

তো জানে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ায় সে কেমন গলগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলে আর ছেলে-বৌ-এর ওপর। সেবার তার যে বড় অসুখটা গেল সে সময় কী দৌড়াদৌড়িই না করেছে সহদেও! সেই দু'ক্রোশ দূরের দাওয়াইখানা থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে এসেছে, সরকারী ডাক্তারকে বুড়ো বাপের 'বেমারি'র কথা জানিয়েছে এবং রোগের অবস্থা অনুযায়ী রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা জেনে এসেছে। এদিকে ঘরে নিজেদের খাওয়ার সংস্থান আছে কি নেই, তবু বাপকে সহদেও বাঁচিয়ে তুলেছে প্রাণপাত করে। কিন্তু সে যাত্রা চলে যেতে পারলেই যেন ভালো হতো!

সেদিন সকালে ঘরের দাওয়ায় এক টুকরো ছেঁড়া চটের ওপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে শুকদেও এমনি সব কথাই ভাবছিল। ঠিক তেমনি সময় একদল লোক এসে দাঁড়ালেন ঠিক তারই সামনে।

এর আগেও আরো কয়বার এমনি সব ভদ্দরলোক দল বেঁধে শুকদেওদের কলোনীর খোঁজ খবর করতে এসেছেন। কাজেই এদের দেখে শুকদেও অবাকও হয়নি, ঘাবড়েও যায়নি। তবে বেশীর ভাগই রাজনীতির লোক এঁরা। সরকারকে ঘায়েল করার মতো অতি সূক্ষ্ম সব প্রশ্নের মালমশলা এঁরা এসে তৈরী করে নিয়ে যান মাঝে মাঝে। এবার যাঁরা এসেছেন তাঁরাও তেমনি লোকই হবেন হয়তো!

শুকদেওর অনুমান যে একেবারে অমূলক নয় চোখের সামনেই তার প্রমাণ। ভদ্দরলোকদের মধ্যে কয়েকজন পেন্সিল আর নোটবই নিয়ে প্রস্তুত। এক একটি প্রশ্নের উত্তর টুকে টুকে নিচ্ছেন তাঁরা একে একে। কাজে লাগাবেন আইন-সভায় বিতর্কের সময়।

ঃ আমাদের যে জমি কেড়ে নিয়েছেন সরকার সে জমির কি তুলন হয় বাবুজী!—বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে শুকদেওর দু'চোখ।

: কেন, সরকার তোমাদের যে জমি দিয়েছেন তাতে ভাল ফসল হচ্ছে না বুঝি ?

: না বাবুজী, দু'সাল তো এমনিতেই কেটে গেল। কেউ কিছুই পায়নি। আশেপাশে জলের চিহ্নও নেই, বৃষ্টিও তেমন বড় একটা হয়নি, পাহাড়ী অঞ্চলে জল না পেলে পাথুরে সব জমিতে কি ফসলই-বা আর ফলবে ?

: তাইতো ! ত'হলে এমনি ভাবে কি করে চলবে তোমাদের ?

: বাবুলোকেরা তো আশা দিয়েছেন, আসছে বার থেকে নাকি ভালো ফসল হবে। দেখা যাক্ কি হয় ? কিন্তু বাবুজী, সমস্যা তো রোজকার। কবে কি হবে সে আশায় তো আর আমরা বেঁচে থাকতে পারছিনা। সরকার ঘর তৈরী করে দিয়েছেন, সে ঘরও তো ভেঙে পড়ছে। খাওয়ার পয়সা জোটে না, ঘর মেরামত করব কি দিয়ে ? গত বর্ষায় ঘরে বসে বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজেই তো মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি।—এই বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বুড়ো চাষী।

: সরকারি ঠিকেদারের তৈরী বাড়ি এর চেয়ে আর কীই-বা ভালো হবে ? এর চেয়ে ভালো করতে গেলে নিজেদের ভালোর দিকটায় যে আবার কমতি হয়ে যায়।—কোন তরুণ এম. এল. এ-র এই স্বগত উক্তি বাহবা পায় আর সবাইর কাছ থেকে।

: আরে দেখুন না বাবুজী, দু'ক্রোশ, তিনক্রোশ পথ দৌড়ে তবে ডাক্তার-বদ্যির দেখা পাওয়া যাবে—এক ফোঁটা ওষুধ মিলবে। বাপঠাকুর্দার ভিটে থেকে উৎখাত করে সরকার এমন জায়গায় আমাদের কলোনী করে দিয়েছেন ! —শুকদেও এমনি সব কথা তুলে চেষ্টা করে আগন্তুকদের সহানুভূতি জাগাতে।

ইতিমধ্যে সুমিত্রা দেবী বন্ধু বন্দনাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতর ছুটে গিয়ে দাঁড়ান তাঁর পাশে।

বন্দনাদেবী কৌশল্যাদের সাংসারিক খোঁজ খবরই করছিলেন তখন। খানিকক্ষণ ধরে সে সব কথাবার্তা শোনার পরই সুমিত্রার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল কৌশল্যার স্বামী আছে কিনা। দুঃখের যে গভীর কালিমা কৌশল্যার সারা মুখখানিকে ছেয়ে ফেলেছিল তাতে তাকে স্বামীহীনা বলেই সন্দেহ হয়েছিল সুমিত্রার। কিন্তু সে সন্দেহ তাঁর ভেঙেছে। 'স্বামী' কথাটির উচ্চারণেই কৌশল্যার চোখেমুখে যে আনন্দ শিহরণ ও লজ্জানুভূতি লক্ষ্য করা গেছে তাতে সে সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

কিন্তু কৌশল্যার যা চেহারা তাতে এ মানুষ কতদিনই বা আর বেঁচে থাকতে পারে? সুমিত্রা আর বন্দনা উভয়েরই মনে এ প্রশ্ন একই সঙ্গে উঁকি দেয়। কৌশল্যার স্বামী নিশ্চয় মাতাল, চরিত্রহীন—নিশ্চয়ই সে তার স্ত্রী সম্পর্কে উদাসীন। এমনি চিন্তা তাঁদের দুজনের মনকেই একসঙ্গে নাড়া দেয়।

ঃ আচ্ছা কৌশল্যা, তোমার স্বামীর নাম কি? —গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন বন্দনা দেবী।

আবার ফিক্ করে একগাল হেসে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফেলে কৌশল্যা।

ঃ বলই না, শুনি তোমার স্বামীর নাম। লজ্জার কি আছে এতে?

ঃ অর্জুন। —শাড়ির আঁচলে ঢাকা কৌশল্যার মুখ থেকে খুব আস্তে এ নামটি বেরিয়ে আসে সুমিত্রা দেবীর তাগিদে।

ঃ একেবারে অর্জুন! —নাম শুনে বন্দনা দেবীর চোখ দুটো কপালে উঠে যায় যেন। সেই মহাভারতীয় নাম! কিন্তু স্ত্রী দ্রৌপদীর জন্যে

কত কষ্টই না সহ্য করেছেন মহাভারতের মহাবীর সেই অর্জুন! আর একালের অর্জুনদের হাতে পড়ে তাদের সহধর্মিনীদের তো এই হাল। স্ত্রীজাতির লাঞ্ছনায় একালের রামলক্ষ্মণ বা ভীমার্জুনদের রক্তে সাড়া জাগে না একটুও। যদি তাই হতো তা'হলে কি দেশের এমনি চেহারা আমাদের দেখতে হতো?

: আহা, চুপ করো না বন্দনা। শোনাই যাক না কৌশল্যার কথা। তোমার বক্তৃতা শোনার সময়তো ঢের পাওয়া যাবে।—বন্দনার কথা এক ধমকে বন্ধ করে দিয়ে সুমিত্রা কৌশল্যাকে জিজ্ঞেস করেন তার স্বামীর কাজকর্মের কথা।

: কীই-বা আর করবে মাইজী! চাষের কাজতো কিছুই নেই এবারও। তাই ভোর না হতেই সে বেরিয়ে যায় জংগলে, কাঠ জোগাড় করে আনে আর তা' বিক্রি করে যে দিন যা পায় তাই নিয়ে কোনদিন সন্ধ্যায় আবার কোন কোনদিন অনেক রাতেই ঘরে ফিরে আসে। উঃ, সে কি কম মেহনৎ মাইজী? একদম আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরে বেচারা! দু'টো কথা বলারও তার আর দম থাকে না, এমনি।—কৌশল্যার প্রতিটি কথায় সুতীব্র মমতা ও সহানুভূতি ফুটে ওঠে অর্জুনের জন্যে। কিন্তু অর্জুন কি তাকে পাল্টা ঠিক তেমনিই ভালবাসে? মনে তো হয় না। সুমিত্রা আর বন্দনা দেবীর মন থেকে কিছুতেই মুছে যেতে চায় না এ সন্দেহ, বরং আরো বেড়েই চলে যেন।

: আচ্ছা কৌশল্যা, তুমি মনে করো না কিছু—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করছি। তোমার অর্জুন নেশা করে?

: মিছে কথা বলবো না মাইজী, নেশা করার পয়সা কোথায় পাবে? তবে উচ্ছবের দিনে আর সবাইর সঙ্গে একটু-আধটু খায় বৈকি! সেতো………।

ঃ ঠিক আছে আর বলতে হবে না।—বন্দনা দেবী থামিয়ে দেন কৌশল্যাকে। বুঝে নেন যে উৎসবের দিনে মেয়েপুরুষ সবাই ওরা নেশার পিপাসায় মেতে ওঠে।

ঃ হুস্।—চারদিকে নানা সরিকের ঘর দিয়ে ঘেরা উঠোনের মাঝখানে শুকোতে দেওয়া যৎসামান্য ধানের ওপর কোত্থেকে একটা কাক এসে বসতেই কৌশল্যা অতি কষ্টে তার ডান পাশ থেকে একখানা সরু লাঠি তুলে তাড়া করে কাকটাকে। কথা বলতে বলতে সে যেন কতকটা হাঁপিয়েও পড়েছে।

কাকটা উঠোনের এক পাশের বড় পেঁপে গাছটার মাথার ওপর গিয়ে বসে তাড়া খেয়ে। ঠোঁট দিয়ে ডানা খুঁচে খুঁচে সে তার পালক পরিষ্কার করছে, না ঠোঁটের নোংরাই পালকে মুছে ফেলছে সেই জানে। কাকটার উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা আর বন্দনার দৃষ্টিও গিয়ে পড়েছে পেঁপে গাছটার ওপর। অনেকগুলো কাঁচাপাকা ছোটবড় পেঁপে ঐ গাছটার বুক জুড়ে আছে। ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। হঠাৎ একটা পাকা পেঁপের গায়ে ঠোকর দিয়ে বসে কাকটা।

ঃ হুস্।—এবার হাততালি দিয়ে কাকটাকে গাছের ওপর থেকেও তাড়িয়ে দেন সুমিত্রা। অমন সুন্দর পাকা পেঁপের গায়ে ঠোকর মারতেই কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে সুমিত্রার মনটায়। মায়ের কোলে ঘুমন্ত শিশুর বুকে সাপের অতর্কিত ছোবলের মতো লাগছিল তাঁর।

ঃ আচ্ছা কৌশল্যা, অর্জুন তোমায় খুব ভালবাসে, আদর করে?—এবার একেবারে সরাসরি এ প্রশ্নই করে বসেন বন্দনা দেবী। স্বামীর অনাদরই কৌশল্যার এ শোচনীয় অবস্থার কারণ কিনা তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যাবে এর উত্তরে, তাইতো বন্দনা দেবীর এ ধরণের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা।

কিন্তু যে দেহাতী তরুণী 'স্বামী' শব্দের উচ্চারণেই ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে লজ্জা থেকে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী তার পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে কি রকম শক্ত ব্যাপার সাহিত্যিকা বন্দনা দেবী যে তা' অনুমান করতে পাচ্ছিলেন না, তা নয়। তবু দেখাই যাক না কৌশল্যা কি বলে, এই মনে করেই এ প্রশ্ন।

কৌশল্যা সত্যি সত্যি মুখ ফুটে কোন কথাই বলতে পারলো না এর উত্তরে।

এতক্ষণ ধরে বন্দনা ও সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে লজ্জার বাঁধ খানিকটা ভাঙলেও মুস্কিল হয়েছে নতুন আগন্তুকদের নিয়ে। এরই মধ্যে আরো অনেকেই এসে ঝুঁকে পড়েছে কৌশল্যার সামনে। এতগুলো উৎসুক দৃষ্টি, বিশেষ করে পুরুষদের উপস্থিতি তার সংকোচকে উল্টে আরো বাড়িয়েই দিয়েছে। কিন্তু তা'হলেও সে তার প্রতি তার স্বামীর ভালবাসায় সন্দেহ স্বীকার করে নেবে কেন?

অর্জুনের প্রেমকে প্রমাণ করতে কৌশল্যা তাই মুহূর্তের মধ্যেই এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করে ফেলে। একটি কথাও না বলে এবং মুখ আব্রু-ঢাকা রেখেই নিঃসংকোচ গৌরবে তার নিজের বুকের কাপড়খানা একটানে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে যায় কৌশল্যা। তার প্রতি অর্জুনের ভালবাসা যে কত গভীর সে কথাটাই কৌশল্যা তার এই নীরব অভিনয়ে প্রমাণ করে দিতে চায়।

মাত্র ষোলদিনের একটি প্রায় নির্জীব শিশু প্রাণপণ চেষ্টা করছে কৌশল্যা মায়ের স্তন থেকে এক ফোঁটা দুধ টেনে নেবার জন্যে। কিন্তু একেবারেই শুকনো যে সেই ক্ষীরসমুদ্র! পাঁচমাথোর রৌদ্রদগ্ধ বিশুষ্ক প্রান্তরের মতোই তার অবস্থা। গলানো লোহার ঈষৎ বাঁকানো দু'টুকরো পাত যেন। মায়ের সেই নিরস ভাঙা স্তন চুষে চুষে শিশুর

গলাও শুকিয়ে এসেছে বুঝি ! মাঝে মাঝে ছেলেটা তাই এক একবার অতিকষ্টে তার অক্ষম হাত-পা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করছে।

শাড়ির আঁচলে কৌশল্যা তাড়াতাড়ি আবার ঢেকে নেয় তার খোকনকে।

সবাই শিউরে ওঠে ঐ কংকাল শিশু আর চামড়ায় ঢাকা কৌশল্যার বুকের পাঁজর কখানা দেখে।

ঃ এ বাচ্চাকে নিয়ে এভাবে কদিন বাঁচবে কৌশল্যা ?—গভীর বেদনা নিয়ে আবার প্রশ্ন করেন বন্দনা দেবী।

ঃ বাঁচবো মাইজী, এ বাচ্চার জন্যেই আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। নতুন ইস্কুল বসেছে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে। আর দশ জনার সঙ্গে আমার বাচ্চাও পড়বে সেই ইস্কুলে, লেখাপড়া শিখে বড় হবে। কী আনন্দ আমাদের হবে তখন, বলুন মা !

ঃ ঠিক বলেছ কৌশল্যা, ছেলে তোমার লেখাপড়া শিখে বড় হলে খুবই আনন্দ হবে তোমাদের। কিন্তু……

ঃ হুঁ মাইজী, সরকারও তো অনেক আশা দিয়েছেন। আমাদের গাঁওছাড়া করে দিলেও বাঁধ দিয়ে ফসলের জন্যে জলের ব্যবস্থা করেছেন, বন্যাও নাকি আর হবে না। নতুন ফসলে ভরে যাবে সারা দেশ। হয়তো আমাদের পরে দুঃখকষ্ট ভুগতে হবে না আর কাউকে। বিজ্‌লী বাতি জ্বলবে ঘরে ঘরে, হাসির ফোয়ারায় মুখর হয়ে উঠবে শহর-গ্রাম। আমরা হয়তো তখন থাকবো না, আমরা তখন দুঃখের সাগরে ভেসে ভেসে কোথায় হয়তো মিলিয়ে যাবো ! কিন্তু সে দুঃখতো শুধু আমাদেরই জন্যে—আমার আর খোকনের বাবার জন্যে। তা' হোক, আমাদের খোকনকে যেন সে দুঃখ স্পর্শ না করে। নতুন ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে সে বড় হবে, দেশের দশজন তাকে সমীহ করে

চলবে—মান্যমাননা করবে, সেই আশায়ই তো বসে আছি মাইজী! তার জন্যেই তো আমাদের আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার।

বল্‌তে বল্‌তে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কৌশল্যা। আবার হাঁপিয়ে পড়ে। হাত দু'টো পিছনদিকে সরিয়ে নিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে সে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করে। গভীর আশায় উষ্ণ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসে কাছের হাওয়াটাকে যেন ক্ষণিকের জন্যে গরম করে দেয়। নিস্তব্ধ হয়ে যায় সবাই।

কৌশল্যাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না কেউ। তাকে নিরিবিলি অবসর যাপনের সুযোগ দিয়ে এক এক করে সবাই যখন চলে আসে তখন শীতের সকালের কুয়াসাও যেন অনেকটাই কেটে গেছে। বাঁশ বনের ফাঁকে ফাঁকে নতুন সূর্যের উঁকিঝুঁকিও সবারই চোখে পড়ে।

নদীর নাম ধলেশ্বরী। বন্দরের নাম তালতলা। তালতলার ঘাটে যাত্রী পারাপার করে ফেরী ষ্টিমার, বড় ষ্টিমারও আসে যায়, নৌকো ভীড় করে থাকে এক সারে। লোকজনের আসা-যাওয়ায়, হাটুরে মানুষের কেনা-বেচায় তালতলায় কল-কোলাহলের বিরাম নেই।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে গাঙের পাড় ভাঙে। জায়গা বদল হয় ফেরী-ঘাটের, নৌকো-ঘাটের। হাটও পিছনের মাঠে ক্রমশঃই সরে সরে যায়। আশপাশের গাঁয়ের মানুষ গাঙের ভাঙন দেখে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির খণ্ড প্রচণ্ড শব্দ করে যখন ধলেশ্বরীর কোলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বিরাট তরঙ্গ তোলে নদীর বুকে, নদীর জল ছিট্‌কে পড়ে চতুর্দিকে, ছেলেমেয়ের দল তখন আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু এই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যত বয়স্করা। ফেরীঘাট, নৌকোঘাট বদল হয় হোক, বসতবাড়ি বদল সে যে বড়ো ভয়ের কথা, দুঃখের কথা। ধলেশ্বরী মায়ের কাছে তাই তারা সকাতর প্রার্থনা জানায়—থামো মা ধলেশ্বরী, থামো।

তালতলা বন্দরের একধার দিয়ে নদীর তীর ভেঙে গ্রামের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে তালতলার খাল। খালের পারে গ্রামের পর গ্রাম। তারই একটি গ্রাম ফুরসাইল।

ফুরসাইলের ফুলকন্যা ফুল তুলে বেড়ায়। ফুলের মতোই ফুট্‌ফুটে তার চেহারা। খালপারের ঝোপ-ঝাড় থেকে, মাথাভাঙা মঠের বাগান থেকে রোজ ঝুড়ি-ভর্তি ফুল তুলে আনে সে সকালবেলা। বাড়ি বাড়ি

গিয়ে সে বিলিয়ে দিয়ে আসে সে সব ফুল। কতকগুলো বাঁধা বাড়ী আছে তার ফুল দেওয়ার জন্যে। মাসে মাসে সে এসব বাড়ী থেকে বিদায়ও পায় কিছু কিছু।

বংশী ঠাকুরের মেয়ে এই ফুলকন্যা। মায়ের দেওয়া আদুরে নাম তার শকুন্তলা। কিন্তু মায়ের কথা তার মনেই পড়ে না। ছোটবেলা থেকেই সে মাতৃহারা। বিধবা এক পিসী কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তাকে। এখন ফুলকন্যার বয়স হয়েছে, পিসীর তাই নানা চিন্তা। ভোর রাত্রে ফুল তুলতে এখন সে বাইরে যায়, এ আর পিসীর পছন্দ নয়।

ঠাকুরভাই, মাইয়া এখন বড় হইছে। একলা একলা আর ঘরের বাইর হইতে দিয়েন না। আপনে তো থাকেন বাইরে বাইরে। আমার কপালে যত ঝঞ্ঝাট!—বিধবা বোনের সব কথাই অন্য দিন যেমন বংশী মুখ বুজে শুনে যায় আজও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। আর সত্যি কথাই তো, কতটুকু সময়ই বা বংশী ঠাকুর বাড়ীতে থাকে!

জীবনে লেখাপড়ার ধার না ধারলেও ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে শালগ্রাম শিলায় নিত্য ফুল-বেলপাতা ছিটিয়ে গ্রাম্য পুরুতের অধিকার লাভ করেছে বংশী ছেলেবেলা থেকেই। বাপের সঙ্গে ঠাকুরপূজো করতে সেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতো। বাপের মৃত্যুর পর পৈতৃক সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে সে কাজ সে-ই চালিয়ে আসছে। তবে এ ছাড়া আর যে কাজটাতে বংশী হাত পাকিয়েছে তাতে তার বাপের কোনরকম সুনাম ছিল এমন কথা কারুরই জানা নেই। সে কাজ যেমনি শক্ত, তেমনি প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের পক্ষেই অপরিহার্য। মানুষের মৃত্যু-সংবাদে মানুষ যে কতদূর আনন্দিত হতে পারে, বংশী ঠাকুরকে দিয়েই তার যথার্থ প্রমাণ দেওয়া চলে। আর এ জন্যেই তো গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তার ডাক আসে সময়ে অসময়ে। দিন নেই রাত নেই, খরা

নেই ঝড়বৃষ্টি নেই, কোন্ গাঁয়ে কে মারা গেছে খবর পেলেই সে ছুট সেখানে। সঙ্গে দু-একজন জুটে যায় তো ভালই, না জুটলেও ক্ষতি নেই—একাই গিয়ে কাজ সেরে দিয়ে আসে বংশী। এ জন্যেই বংশীর ওপর মড়া-পোড়ানোর ভার দিতে পারলে সবাই নিশ্চিন্ত। তার সঙ্গে শুধু গাঁজার চুক্তি। ব্যস! আর কাজের শেষে শ্মশানবন্ধুদের কিছু মিষ্টি খাইয়ে দিতে পারলেই সে খুশি।

এ ভাবেই দিন কাটে বংশী ঠাকুরের, কিন্তু এদিকে ঘরে যে মেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে তার দিকে মোটে খেয়ালই নেই তার। বোন তো সেই জন্যেই চিন্তায় আকুল। কিন্তু আকুল হয়েই বা কি হবে? শুধু শুধু ঠাকুরপূজোর চাল-কলা দিয়ে তো আর গোটা সংসারটা চলতে পারে না, শকুন্তলার ফুলের টাকাটাও যে মস্তবড় একটা সাহায্য তাদের পক্ষে। তাই তার ফুল তোলার কাজটা একেবারে বন্ধই বা করে দেওয়া যায় কি করে? বংশী ঠাকুরের বিধবা বোন গভীরভাবে এ সব কথা চিন্তা করে, কিন্তু আয়ের আর কোন পথই খুঁজে পায়না সহসা।

দিনগুলো যেন অতিকষ্টে গড়িয়ে চলে। বংশী ঠাকুরের বিধবা বোন বৈজয়ন্তী আর পারে না। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে সে বেচারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো। অন্ততঃ দু'দিন তো তার নিজের চোখেই পড়েছে, মাথাভাঙা মঠের বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসবার পথে শকুন্তলা বঙ্কিম মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। হোক না স্বদেশীওয়ালা, তবু তো সে ব্যাটাছেলে! তার সঙ্গে এত হাসি-পরিহাসের গল্প কিসের? সোমত্ত মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরপুরুষের সঙ্গে এমনি করে গাল-গল্প করতে দেখলে লোকেই বা কি বলে? আর সে মেয়ের কখনো বিয়ে হয়?

বৈজয়ন্তী মনে মনে কেবল এসব কথাই ভাবে আর দুঃখ করে। তার নিজের ছেলেপুলে সংসার কিছুই নেই, ভাই-বউ তাকে কি মহাদায়ই না গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ল! সমস্ত কথাই সে বড় ভাইকে জানিয়েছে, কিন্তু তার কাছে কোন প্রতিকারের আশা করাই বৃথা। সন্ধ্যা হতেই বংশী ঠাকুর প্রায় রোজই সেই যে চলে যায় ত্রিনাথের মেলায় গাঁজার আড্ডায়, তারপর কত রাত্রিতে যে ফেরে তার কেউ কোন খোঁজই রাখে না। এর ওপর মড়া পোড়ানোর ডাক এলে তো কথাই নেই। কাজেই এমন লোককে কিছু বলা না-বলা সমান কথা। মা-মরা মেয়েকেও আবার বেশী কিছু বলতে সাহস হয় না। কে জানে, আবার কিসে কি হয়ে বসে? বলা তো যায় না, দিনকাল যা পড়েছে।

ঠাইনপিসী, ঐ মঠটার নাম মাথাভাঙার মঠ হইছে ক্যান বলতে পার?—বাড়ি বাড়ি ফুল বিলিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে পিসীকে প্রশ্ন করে শকুন্তলা।

আমরা এইসব জানব কি কইরা মা, আমরা কি লেখাপড়া শিখছি?

বা রে, তোমরা গ্রামের লোক, গ্রামের মঠমন্দিরের কথা জানবা না? এইতে লেখাপড়া শিখনের কি আছে?—পাল্টা প্রশ্নে শকুন্তলা ঘায়েল করে তার পিসীকে।

বেশ তো মা, তুই জানস্ যখন তুই-ই বল্না আমি শুনি।—ডাল সম্বরা দিতে দিতে জবাব দেয় বৈজয়ন্তী।

শোন ঠাইনপিসী, কয় পুরুষ আগে জমিদার-বাড়ির কোন ছেলে নাকি এই মঠ তুইল্যা বলছিল যে, মায়ের ঋণ শোধ করলাম। আর অমনি নাকি মঠের মাথা ভাইঙা পইড়া যায়। মায়ের ঋণ নাকি শোধ করা যায় না, তার জন্যই মঠের মাথা ভাইঙা পড়ছে, বুঝলা ঠাইনপিসী? আমি তো মায়েরে দেখিই নাই, মায়ের ঋণ আর কি বুঝুম!

তুই এত কথা জানলি কার কাছ থ্যাইক্যা রে শকুন্তলা ?—জিজ্ঞাসা করে বৈজয়ন্তী।

বঙ্কিম মাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসা কইরা জানলাম। তিনি তালতলা বাজারের দিকে যাইতে আছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা। কথায় কথায় তারে মঠের নামের কথা জিগাইলাম। তিনি বইল্যা দিলেন।

মাস্টারের নাম শুনে আর সহ্য করতে পারেনা বৈজয়ন্তী, একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

তিনি বইল্যা দিলেন! যা না, বঙ্কিম মাস্টারের সঙ্গে একত্রে গলায় দড়ি দিয়া ধলেশ্বরীতে যাইয়া ডুইব্যা মর্ গিয়া অভাগী! এত জ্বালা আমি আর সইতে পারি না।

পিসীর অগ্নিমূর্তি দেখে অবাক হয়ে যায় শকুন্তলা। সে বুঝতেই পারে না, কি তার অপরাধ। গালাগাল খেয়ে সে চুপ করে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে শোবার ঘরের এক কোণে। বসে বসে ভাবে। আচ্ছা, বঙ্কিম মাস্টার কি খারাপ লোক? খারাপ লোক হ'লে সবাই তাঁকে অত সম্মান করে কেন? কয়েক মাস আগে মাস্টার যখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলেন তখন তিন-চার গ্রামের লোক মিলে তাঁকে মালা পরিয়ে মিছিল করে সারা রাস্তা ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। তিনি যদি খারাপই হবেন তা হ'লে তাঁকে নিয়ে এত হৈ-চৈ হতে পারে কখনও? তালতলা বাজারের দোকানীদের ওপর অন্যায় রকম তোলা-বসানোর বিরুদ্ধে বঙ্কিম মাস্টার যে-জমিদারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন সে জমিদারও তাঁকে সম্মান করেন, তাঁর মিছিলে সেই জমিদারের ছেলে নরেশও একজন উদ্যোগী। তাঁর মত লোকের সঙ্গে কথা বলায় যে কি দোষ হতে পারে শকুন্তলা তা ভেবেই পায় না।

গাঁয়ের আর সব গরীব ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বঙ্কিম মাস্টারের অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে সে-ও তো দু' বছর আগেও লেখাপড়া করেছে। মাস্টার তাকে খুবই ভালবাসতেন, 'ফুলকন্যা' বলে ডাকতেন। সে সময়ও শকুন্তলা দেখেছে, সবাই তাঁকে কেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করে। মাস্টার যদি ভালই না হবেন তা'হলে জমিদার বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারতেন এতদিন ধরে, না, গ্রামবাসীদের হয়ে জমিদারের সঙ্গে লড়াই করা সত্ত্বেও তাঁকে জমিদার এতকাল বারবাড়িতে রাখতেন এমনি আদর করে? কোথায় তার দোষ হলো শকুন্তলা ভেবেই পায় না।

এত গালমন্দ করলাম মা-মরা মাইয়াটারে?—আপন মনেই দুঃখ করে বৈজয়ন্তী রান্নাঘরের কাজ সারতে সারতে। আর কি-ই বা কাজ রান্নাঘরে? কোন রকমে ডাল-ভাতটা নামিয়ে, হেঁসেল নিকিয়ে বৈজয়ন্তী শোবার ঘরে গিয়ে দেখে, শকুন্তলা এক কোণায় দু-হাঁটুতে হাতের ওপরে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে।

শকুন্তলা!

শকুন্তলা নিরুত্তর। অভিমানে সে আর মাথা তুলতে পারছে না। মেয়ের এই অবস্থা দেখে পিসীই শকুন্তলাকে কোলে টেনে নিয়ে কাঁদতে সুরু করে দেয়!

আমি তোরে এমন কি বলছি বল্! লোকে নানান কথা কইতে পারে। সেই ভয়েই তো আমি একটু সাবধান কইরা দিছি। আজ বৌ-ঠাইন থাকলে কত কথা বলত! আমি পিসী বইল্যাই আমার কথায় এত রাগ, আমি বুঝি না। সবই জানি পরের পেটের সন্তান কি আর নিজের হইতে পারে? থাউক, যা হওনের হইব, আমি আর কোনদিন কিছু কমু না। তবু তুই কথা ক, এই রকম কইরা চুপ কইরা থাকিস না, আমি সহ্য করতে পারি না।

বৈজয়ন্তীর মনের গভীর বেদনা ফুটে ওঠে তার প্রতিটি কথায়। শকুন্তলার অভিমানকে ছাপিয়ে ওঠে ব্যথার অনুভূতি। শকুন্তলা চোখ মেলে তাকায় তার পিসীর চোখের দিকে। সন্তানহীনা বৈজয়ন্তী অভিভূত হয়ে পড়ে মাতৃহারা শকুন্তলার স্নেহার্ত চাহনিতে। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে তার দুই গণ্ড বেয়ে। পিসীর চুম্বনসিক্ত ফুলকন্যা আবার সোজা হয়ে উঠে বসে। কথা কয়। ভুলে যায় সে অতীতকে।

পিসী-ভাইঝির মধ্যে মান-অভিমানের পালা যতই চলুক, বৈজয়ন্তীর আশঙ্কা কিন্তু অমূলক নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তার প্রমাণ মিলে যায়। মাঘের প্রথম সপ্তাহে শকুন্তলা পৌষের ফুল তোলার টাকা হাতে দিতেই বৈজয়ন্তী চমকে ওঠে।

এত বেশি টাকা যে এইবার?

বঙ্কিম মাস্টারের কথায় আমি এইবার সক্কলের কাছ থাইক্কাই ডবল কইরা পয়সা নিছি। চাইর আনার জাগায় আট আনা। মাস্টার মশয়ও সক্কলেরে বইল্যা দিছেন। সত্যই আমি ঠকতে আছিলাম এতদিন ধইরা। মাস্টার মশয় নতুন কয়টা বাড়িও ঠিক কইরা দিছিলেন।

অভাবের সংসারে কয়েকটা টাকা বেশি আসায় বৈজয়ন্তী খুশিই হয় সন্দেহ নাই, তবে শকুন্তলার ভাল করার জন্যে বঙ্কিম মাস্টারের এত গরজ দেখে তার সন্দেহ আগের চেয়েও বেশি বেড়ে যায়। তবুও সে চুপ করেই থাকে। সেই একদিন বলেই তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়।

মাঘের কন্‌কনে শীতকে উপেক্ষা করে গাঁয়ের মেয়েরা পৌষ সংক্রান্তি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তারাব্রত করে চলেছে। পুরো এক মাসের এ ব্রতাচার। পরিষ্কার উঠোনে আলপনা এঁকে শকুন্তলাও গত দু'বছর

ধরে এ ব্রত পালন করে আসছে। এমনি এক সন্ধ্যায় আলপনা-কাটা ঘরে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা ফুলদূর্বা ছিটিয়ে ছিটিয়ে তারাব্রতের বন্দনাগান গাইছে—

তারা পূজলে কি বর পায় ?
ভীম অর্জুন ভাই পায়......

ঠিক এমনি সময় বাড়ির দরজায় একদল লোক এসে ডাকে—বংশী ঠাকুর ঘরে আছ নাকি !

বংশী সেদিন অসুস্থার জন্যে বাড়িতেই ছিল। দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে তারই দলের লোকের ডাক শুনে হুঁকো হাতে করেই সে এগিয়ে যায় তাদের অভ্যর্থনা জানাতে।

আরে মাস্টার মশয় যে! আসেন, আসেন।—বংশী সকলকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসে। বৈজয়ন্তী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় ভাঙা চাটাইখানা পেতে দিয়ে যায়। ভাইঝির ব্রতকথার সামনে তার থাকা দরকার, সেখানেই গিয়ে সে বসে। কিন্তু মাস্টারের উপস্থিতি তার ভাল লাগে না।

শকুন্তলার মন্ত্রপাঠ তখনো শেষ হয় নি। সে বলে চলে—

শিবের মতো স্বামী পায়,
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
তারা পূজি সাঁজ রাতে,
সোনার শাঁখা পরি হাতে।

বঙ্কিম মাস্টার হঠাৎ তাঁর দলবল নিয়ে বাড়িতে এসে উঠলেও

শকুন্তলা লজ্জায় যে তার মন্ত্রপড়া বন্ধ করে দেবে তার উপায় নেই। কাজেই সবার সামনেই সে সুর করে তারাব্রতের ছড়ামন্ত্র পুরোপুরিই পড়ে যায়। আর সবাই বংশী ঠাকুরের সঙ্গে নানা কথায় এবং তামাকসেবনে মত্ত হয়ে পড়লেও বঙ্কিম মাস্টার কিন্তু ফুলকন্যার মন্ত্রপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কান পেতে থাকেন সে দিকেই। আহা, কী সুন্দর মিষ্টি সুর, কি চমৎকার বলার ভঙ্গী! একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান মাস্টার।

হ্যাঁ, যে কথার জন্যে আসা। শুনুন ঠাকুর মশাই, মদ-গাঁজার দোকান আমরা এ তল্লাট থিকা তুইল্যা দিমু। আমাদের গরীব দেশ। সাধারণ মানুষ রীতিমতন দুই বেলা দুই মুঠা ভাত পায় না, অথচ মদ গাঁজা খাইয়া কম পয়সা নষ্ট করে তারা! এ অবস্থা আমরা আর চলতে দিমু না। আমাদের এই কাজে আপনের সাহায্য চাই আমরা।

আমার সাহায্য! এইটা কি কইলেন মাস্টার মশয়? আমি কি একটা সন্ধ্যাও গাঁজা না খাইয়া থাকতে পারুম? পেট ফুইল্লাই যে মইরা যামু।—বংশী ঠাকুর বঙ্কিম মাস্টারের কথায় বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে জবাব দেয়। তার পক্ষে গঞ্জিকাসেবন ত্যাগ করা যে অসম্ভব ব্যাপার, তাই সে বোঝাতে চায় মাস্টারকে। কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধবরাই তাকে আরো বেশি অবাক করে দেয়।

না ঠাকুর, মদ গাঁজা আমরা ছাইড়াই দিমু ঠিক করছি। মাস্টার মশয় আমাগো ভাল পরামর্শই দিছেন। নেশা কইরা আমরা গরীব মানুষেরা যে পয়সা উড়াই তা দিয়া পেট ভইরা ভাত খাইলে শরীরটা বাঁচে। আমরা মাস্টারের কথা মতনই চলুম। তোমারেও তাই করতে অইব।

আঃ, কি কইলা! বেশ তো, তোমরা সকলে যদি গাঁজা ভাঙ ছাড়তে পার তা অইলে আমারই বা না পারনের কি? তবে মড়া

পোড়াইতে গিয়া দুই এক কল্কি না টানতে পারলে বেশ একটু কষ্টই অইব। তা হউক, তোমরা সবাই যখন মাস্টারের কথায় কথা দিছ, আমিও দিলাম।

ব্যস্, কাল থিকাই তালতলা বাজারের আবগারী দোকানে সত্যাগ্রহ সুরু হইব। আশপাশের কোন গ্রামের এক জনও খরিদ্দার যাতে এই বাজারের আবগারী দোকানগুলিতে না আসতে পারে তার ভার আপনাগোই লইতে হইব। সবাই একটু নজর রাখবেন। আমি তো এই কয়দিনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুইরা অনেকেরেই বইল্যা আইছি এবং অনেকেরই কথা পাইছি। আমার মনে হয়, এই তল্লাটে মাদক বর্জনে বেশি বেগ পাইতে হইব না। আপনেরা যদি ঠিক থাকেন, তাইলেই আমি নিশ্চিন্ত।—বংশী ঠাকুরের কথা পেয়ে বঙ্কিম মাস্টার তাঁর মাদক বর্জন আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

সত্য সত্যই পরদিন থেকে আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। মদ গাঁজা ভাঙের খদ্দের আর বড় একটা দেখা যায় না। চোরাই বেচাকেনাও যা চলে তাও নিতান্তই সামান্য।

প্রায় মাসখানেক এভাবে চলার পর গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার নিতাই পাল একদিন এসে বললে বঙ্কিম মাস্টারকে, দোকানটা বন্ধই কইরা দিতে হইব মাস্টারবাবু। এরই পর হঠাৎ এক রাত্রিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে গাঁজার দোকানে। ঠিক আগের দিনই বঙ্কিম মাস্টার তাঁর মায়ের গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে বাড়ি চলে গেছেন শ্রীনগরে। সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁর দলের আরো কয়েকজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মুন্সীগঞ্জে দ্বিতীয় হাকিমের এজলাসে বিচার চলে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিতে হয় সকলকেই।

তালতলা বাজারে মাদক বর্জন আন্দোলনের সাফল্য লাভ ঘটে এই ভাবে। বঙ্কিম মাস্টারের আবার জয়ধ্বনি ওঠে গ্রামে গ্রামে। ফুলকন্যার মনও খুশিতে ভরে ওঠে মাস্টারবাবুর জয়ে। তার খুশি হবার আরো বেশি কারণ, বাবা তার কিছুদিন ধরে বেশির ভাগ সময়েই বাড়িতে থাকে।

ইতিমধ্যে বাড়িতে এসেই বঙ্কিম মাস্টার একদিন ধন্যবাদ জানিয়ে যান বংশী ঠাকুরকে তার সহযোগিতার জন্যে। হাসিখুশি ফুলকন্যা পান সেজে এনে দেয়, মাস্টার তারিফ করেন। আর সবই দূর থেকে লক্ষ্য করে শকুন্তলার বৈজয়ন্তী পিসী। হাড়-মাস জ্বলে ওঠে পিসীর এসব কাণ্ডকারখানা দেখে।

যা রটে, তার কিছুটা বটে! লোকের মুখ বন্ধ করুম কি কইরা? আর মানুষে কি মিছামিছিই বলে? আমার চোখেই ভাল লাগে না, অন্যের ভাল লাগবো কি কইরা? মাস্টারের সঙ্গে মাইয়াটা খারাপ হইয়া গেছে বইল্যা যে কথাটা দক্ষিণের বাড়ির সোনাখুড়ি, গাঙ্গুলী-বাড়ির ধন-বৌ কাইল কইয়া গেল, পান দেওনের ছিরি দেইখ্যা আমি তো আর সেই কথা মিথ্যা মনে করিতে পারি না। ঠাকুরভাই, আপনের মাইয়া লইয়া আপনে থাকেন, আমি আর এই বাড়িতে থাকতে পারুম না।—মাস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বৈজয়ন্তী উত্তেজিত হয়ে তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়।

আরে, এত রাগ করিস না। একটা কথা শোন। লোকে তো কতই কয়। ভজা আর গণশা আমারে একটা প্রস্তাব দিছে। আমার কাছে কিন্তু প্রস্তাবটা ভালই লাগল। বঙ্কিম মাস্টারের মা মারা গেছে, সংসারে তার নিজের বলতে আর কেউ নাই। সে নাকি এখন বিয়া করতে রাজী হইছে। আমাগো দুঃখ-কষ্ট দেইখ্যা শকুন্তলারে সে নাকি

নিতে চায়। মন্দ কি? একটু বয়স বেশি। তা হোক গিয়া। মাইয়াটা খাইয়া পইরা তো সুখে থাকব, আর একটু মান-সম্মানও পাইব। কি বলিস্ তুই?

আপনের যা ইচ্ছা তাই করেন গিয়া। আমারে এই সবের মধ্যে টাইনেন না। এই মাস্টারেরে লইয়া মাইয়ার যত কুৎসা। আর তার সঙ্গে বিয়া হইলে কেলেঙ্কারির সীমা থাকবো না। আমি কিছু জানি না, আমারে কিছু জিজ্ঞাস কইরেন না। আমি এই বাড়ি ছাইড়া চইল্যা যাই, তারপর যা ইচ্ছা তাই করেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই বাপ আর পিসীর বাক্-বিতণ্ডা শোনে শকুন্তলা। এ ধরণের কথাবার্তা সে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

তোমার আর যাইতে হইব না ঠাইনপিসী। আমিই যামু।

শোনেন ঠাকুরভাই মাইয়ার কথা।—ঘরের পিছন দিয়ে বাগানে যেতে যেতে বৈজয়ন্তীর এই কথাটুকু শকুন্তলার কানে যায়। তার পরে তাকে নিয়ে আর বড় বেশি কথা হয়ও নি। তবে বংশী ঠাকুর তার বোনকে নানা রকমে বুঝিয়েছে তার রাগ ভাঙাবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত বৈজয়ন্তী শান্ত হয় এবং সব গোলমালও মিটে যায়।

বঙ্কিম মাস্টারের সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ের প্রস্তাবের কথাটা গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলে বলার কিছু থাকতো না, কিন্তু নানা রঙে রাঙিয়ে নিয়ে চলতে থাকে নানা রকমের রটনা।

ফুলকন্যাকে বঙ্কিম মাস্টারের ভালো লাগে, তাকে তিনি বিয়েও করবেন ঠিক করেছেন। তাতে তাঁর ভালোলাগাই শুধু সার্থক হবে না, একটা বিপন্ন পরিবারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। ভিন্ন গ্রাম থেকে স্থানীয় হাইস্কুলে মাস্টারি করতে এসে তিনি এ গ্রামেরই সেবায়

সতেরো বছর কাটিয়ে দিলেন। স্বদেশী করতে গিয়ে বৃটিশ আমলের সরকারী সাহয্যপ্রাপ্ত সেই স্কুলের শিক্ষকতা হারিয়ে তিনি এ গ্রামেই রয়ে গিয়েছেন এবং গ্রামের জমিদারের আশ্রয়ে থেকেও গ্রামবাসীদের স্বার্থরক্ষায় অবিরাম সংগ্রাম করে আসছেন জমিদারের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও সেই গ্রামবাসীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়! এ সব শুনে বিস্মিত এবং ব্যথিত হন বঙ্কিম মাস্টার। কিন্তু বাংলা দেশের এই তো গ্রাম-চরিত্র। এ সবে ভ্রূক্ষেপ করলে কোন কাজই করা চলে না, এ তিনি ভালো করেই জানেন।

পরদিন মুন্সীগঞ্জে মহকুমা কর্মী সম্মেলন। আগের দিনই সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছতে হবে। ফিরতে দিন দুই হয়তো দেরি হতে পারে। বিয়ের ব্যাপারটা যা হয় ফিরে এসেই সঠিকভাবে স্থির করা হবে, এ কথাটা মাস্টার জানিয়ে যান বংশী ঠাকুরকে।

সেদিনই রাত্রিবেলা বংশীর বাড়িতে হঠাৎ হৈ-চৈ পড়ে যায়।

বলছিলাম না ঠাকুরভাই, একটা কিছু কেলেঙ্কারি হইবই। আগের থিকা একটা সম্বন্ধ ঠিক কইরা মাইয়াটারে পার কইরা দিলে আইজ এই লজ্জায় পড়তে হইতো? এখন কোন্‌খানে গিয়া খোঁজবেন আপনের আদরের শকুন্তলারে? বঙ্কিম মাস্টার খুব ভাল লোক, দেখেন এখন কেমন ভাল।

বৈজয়ন্তীর চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন এসে জড়ো হয়ে যায়। অযথা হৈ-হল্লা না করে শেষরাত্রিতেই বংশীর মুন্সীগঞ্জে চলে যাওয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত করে সবাই। বংশী তাই করে। মুন্সীগঞ্জে গিয়ে দেখাও পায় বঙ্কিম মাস্টারের। মাস্টার সব শুনে তো অবাক। সম্মেলন শেষ হ'লে মাস্টারের সঙ্গেই বংশী গ্রামে ফিরে আসে।

ফুলকন্যার কোন হদিস না পাওয়ায় শুধু বিস্ময় নয়, আতঙ্কও দেখা

দেয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। বৈজয়ন্তী ভাবে, তবে কি তার কথায় রাগ করেই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল মেয়ে? আত্মহত্যা করে বসে নি তো? নদীর পারে বাড়ি, বলা যায় না কিছু। আত্মহত্যার কথা মনে আসতেই শিউরে ওঠে বৈজয়ন্তী।

দূর, তা কি হতে পারে? আমাদের এত ভালবাসে শকুন্তলা, এমন কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না।—হঠাৎ চিন্তার মোড় ঘুরে যায় বৈজয়ন্তীর। পাড়া-পড়শী মেয়েরা কত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, সান্ত্বনার কথা কয়, কিন্তু কোন কথাই তার কানে যায় না।

বংশী ঠাকুর, বঙ্কিম মাস্টার আর তাঁর ছেলের দল সবাই ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। নিরাশ হয়ে যায় সবাই। থানা-পুলিশ কিছুই বাদ যায় নি। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

বঙ্কিম মাস্টার ঘুমুতে পারেন না। দু'চোখ বুজে আসতেই হঠাৎ ধলেশ্বরীর প্রচণ্ড ঢেউ যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আরো জোরে ঢেউ আসে, আরো জোরে। ভয়ে ভয়ে উঠে বসেন মাস্টার। না, কিছুই তো নয়। স্বপ্ন। আবার শুয়ে পড়েন, জানালার ফাঁক দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নেন বাইরে কত রাত দেখে নেবার জন্যে।

ফুলকন্যা! তাঁরই দেওয়া এ নাম ধরে যেদিন প্রথম বঙ্কিম মাস্টার ডেকেছিলেন তাকে তাঁর নৈশ বিদ্যালয়ে, সে ডাক শুনে শকুন্তলার মুখে ফুলের মতো যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল তা মনে পড়ে যায় মাস্টারের। এই তো সেদিন মাথাভাঙা মঠের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল ঐ মা-মরা মেয়ে। কোথায় সে যেতে পারে? ভাবতে ভাবতে আবার চোখ বুজে আসে মাস্টারের।

ধলেশ্বরীর বুকে সাঁতার কাটছে ফুলকন্যা? ভীষণ ঢেউ। সেই

প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই সে এগিয়ে আসছে। বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন ফুলকন্যা! তারই পাশে আর একজন কে? তাকে উদ্ধার করতেই বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোন তরুণ। কিন্তু তাঁরই তো প্রথম এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এই অসহায় মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্যে! স্বপ্নের ঘোরে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেন বঙ্কিম মাস্টার।

গভীর ঘুম। মাথাভাঙা মঠের পিছনে গভীর জঙ্গলে একসঙ্গে শেয়াল ডেকে ওঠে কয়েকটা। পাখির ডানার ঝটাপট্ শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রাত্রির নীরবতা। নিয়মিত ঝঙ্কার তুলে গাঁয়ের ঘুমন্ত মানুষকে সচকিত করে দিয়ে এগিয়ে চলে ডাকহরকরা।

কে? কে?—দরজায় আকস্মিক কড়ানাড়ার শব্দে আঁৎকে ওঠেন বঙ্কিম মাস্টার। এই অসময়ে কে আসবে তাঁর কাছে? ফুলকন্যা?

কে?—আর একবার কড়ানাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে উঠে আসেন মাস্টার। দরজা খুলে দিতেই সবিস্ময়ে দেখেন, সামনে তাঁর প্রিয় ও প্রাক্তন ছাত্র নরেশ আর আদরের শকুন্তলা। দেখা হতেই তারা দু'জন প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেয় তাদের মাস্টার মশাইয়ের।

ব্যাপার কি বল তো? ফুলকন্যার জন্যে চারদিকে তোলপাড় চলছে দু'দিন ধরে, আর সে তোমার সঙ্গে এই অসময়ে আমার এখানে?

এই মাত্র বরিশালের ষ্টিমারে ফিরলাম আমরা ঢাকা থেকে। আপনার আশীর্বাদ চাই আমরা।—এই বলে নরেশ একটি চিরকুট দেয় তার মাস্টার মশাইকে।

ভোরের প্রথম আলোয় মাস্টার সেই কাগজের টুকরোয় চোখ

বুলিয়ে দেখলেন, ঠিক আগের দিনই ঢাকায় তাঁর ফুলকন্যার রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে নরেশের সঙ্গে।

বেশ!—শুধু এইটুকু বলেই চিরকুটখানা মাস্টার ফেরৎ দিলেন নরেশকে, তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন তাঁর বিছানায়।

বঙ্কিম মাস্টারের ঘর থেকে নেমে এসে জমিদার-বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই পাশের একটা গাছে থেকে একজোড়া পাখি উড়ে গিয়ে ভোরের কাচা আলোয় আনন্দের ডাক ডাকতে ডাকতে চলে গেল নরেশ আর শকুন্তলার মাথার ওপর দিয়ে।

প্রত্যাখ্যান

লাইট-পোষ্টের সামনে নতুন একখানা অষ্টিন দাঁড়িয়ে।

গাড়ির কালো রঙের আলো ঠিকরে পড়ছে। সমুখেই একটা সিনেমাহল। প্রকাণ্ড দালানের গায়ে চটকদার সব বিজ্ঞাপন।

খানিকটা দূরেই একটা ডাষ্টবিন। নানা জঞ্জালে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে ডাষ্টবিনটা। এমন কি অনেক আবর্জনা উপচে পড়ে আশপাশের অনেকখানি জায়গাও নোংরা করে ফেলেছে। ছেঁড়া কলাপাতা, ভাঙা মেটে গ্লাসের টুকরো আর মাছ-মাংসের হাড়-কাঁটা ও ফেলে দেওয়া পাতের খাবারে চারদিকটা একেবারে একাকার হয়ে আছে। বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে। এক ভদ্রলোক নাকে রুমাল দিয়ে পথ চলতে চলতে কর্পোরেশনের বাপান্ত করে ছাড়ছে মনে মনে।

পাশের বড়ো বাড়িটাতেই বোধহয় কাল রাতে কোন উৎসব হয়ে গিয়ে থাকবে। ডাষ্টবিনের এ দৃশ্য হয়তো সগৌরবে তারই পরিচয় বহন করছে। এদিকে ওদিকে কুকুরও জুটেছে কয়েকটা। একটা কুকুর আর একটাকে খানিক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিয়ে এসে নিশ্চিন্তে একটা মাংসের টুকরোকে আবোল-তাবোল কামড়াতে সুরু করে। মাঝে মাঝে এধার ওধারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কুকুরটা আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এলো কিনা। এ এলাকাটা যেন তারই একচেটিয়া, অন্যের শরিকানা তার আদৌ পছন্দ নয়।

একটা লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রুক্ষ চেহারা, প্রায় নগ্ন, ধূলি-মলিন দেহ। পাগলও হতে পারে! চোখেমুখে কেমন একটা নিঃসহায়তার চিহ্ন। অতি কাতর ও রুগ্ন।

লোকটা আস্তে আস্তে আরো খানিকটা এগোয়। ওপরে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবে। কি সে ভাবে সে-ই জানে। যার সম্বলের মধ্যে মাথার ওপরে ঐ মহাকাশ আর পায়ের তলায় কঠিন ধরিত্রী, তার আবার কিসের ভাবনা? তবু সে কি যেন একটু ভেবে নেয়।

ঃ ভগবানকে অসীম ধন্যবাদ।—অস্ফুট স্বরে লোকটাকে বলতে শোনা যায়। তারপরেই তার নিষ্প্রভ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নেমে আসে। তার চোখে বোধহয় ধাঁধাঁ লেগে যায় ডাষ্টবিনটা ও তার চতুর্দিকে ছড়ানো আহার্যের অপচয় দেখে। অভুক্ত মানুষ দু'মুঠো ভাতের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে আর মাছ-মাংস-পোলাওয়ের প্রাচুর্যের মধ্যে কুকুরের মহোৎসব চলছে?

লোকটা আবার কি যেন চিন্তা করে। হঠাৎ হেসে ওঠে হিঃ, হিঃ, হিঃ।

এ দিকে হা-ভাতে কুকুরটা এক পাশের খাবার প্রায় সবটাই নিঃশেষ করে এনেছে। লোকটার লোলুপ দৃষ্টি হিংসায় যেন একেবারে জ্বলে ওঠে। চারদিকে একবার চোখ দু'টোকে ঘুরিয়ে নিয়ে সে চট্ করে গিয়ে বসে পড়ে ডাষ্টবিনটার একধারে। সে অনন্যোপায়। এখান থেকেই সে আরো কিছুদিন বাঁচার মতো শক্তি সঞ্চয় করে নেবে, মনে মনে সে তাই ঠিক করে ফেলেছে।

ক্ষুধার আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে লোকটার দু'চোখ থেকে। একই সঙ্গে সব কিছু উদরসাৎ করতে পারলেই যেন ভালো হতো! কুকুরটাকে তার মোটেই আর সহ্য হচ্ছে না। সে বেটা যে ক্রমাগত খেয়েই চলেছে। নিজের দিকটা শেষ করে সে এবার তার এলাকাতেই এসে পড়েছে একেবারে! জানোয়ারটাকে হাত দিয়ে তাড়া করতে চেষ্টা করে বেচারা, কিন্তু কুকুরটা বড্ড সেয়ানা। এক পা-ও সে নড়তে

নারাজ। বরং ঘেউ ঘেউ করে সে তার প্রভুত্বই বুঝিয়ে দিতে চায় লোকটাকে। জন্তু-জানোয়ার হলেও মানুষ সে চেনে। বিশেষ করে এ লোকটার মূল্য সে প্রথম থেকেই বুঝে নিয়েছে। সে যে তার মতোই অক্ষম, নিরুপায়—সামান্য পশুর বুদ্ধিতেও তা' ধরা পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত পাশাপাশিই আহারের প্রতিযোগিতা চলে কুকুর আর মানুষের মধ্যে। হাজার হাজার লোক পাশ দিয়েই আসে যায়। এ দৃশ্য কাউকেই বিচলিত করে না। দেখেও যেন কেউ দেখে না। সবাই কাজের লোক। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেবার সময় কোথায় ? বড়ো জোর চলার মুখে দু'একজনকে বল্‌তে শোনা যায়, আহা বেচারা! আবার কেউ বা চল্‌তে চল্‌তে নাক সিট্‌কে বলে যায়, উঃ কী সাংঘাতিক। ব্যস্‌, ওই পর্যন্তই। এর চেয়ে বেশি সহানুভূতি বা সমবেদনা কারুর কাছ থেকেই জোটে না। মন্বন্তরের মড়ক এ দৃশ্যকে স্বাভাবিক করেই তুলেছে।

রাত্রি বেড়ে চলে। পথের জনস্রোতও কমে আসে ধীরে ধীরে। একেতো নিষ্প্রদীপের যুগ। তার ওপর দোকানের আলো নেভে এক এক করে আর স্তিমিত হয়ে আসে রাজধানীর রাত্রির ঔজ্জ্বল্য।

এরই মধ্যে সিনেমা-শো ভাঙে। রাজপথে কাতারে কাতারে নেমে আসে বিলিতি ছবি-দেখা নর-নারী। কারুর মুখে চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়ের তারিফ, কারুর মুখে জর্জিয়া হেলের। মেয়েদের মধ্যে আবার রূপ-সজ্জার জলুষ নিয়েও বেশ আলোচনা চলে। তাদের কাছে থিয়েটার দেখাটা গৌণ, পোষাকের পরিপাট্য দেখানোটাই যেন মুখ্য।

ঃ যা মলো, ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে গেলো নাকি! কতোক্ষণ আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে!—এক সদ্য বিবাহিত তরুণ তার স্ত্রীকে নিয়ে ট্রাম-বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

আর সহ্য করতে না পেরে একটা রিক্সায় চেপেই শেষ পর্যন্ত রওনা হয়ে যান।

ঃ ভারি মুস্কিলই হলো কিন্তু! আমি ভাই কোলের বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। ছেলেটা জেগে পড়লে আবার কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। না, বাঁচা গেলো বাবা, ঐ যে ট্রাম আসছে! ওটাই হয়তো শেষ ট্রাম।—এই বলেই মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা তাঁর দলবল নিয়ে প্রস্তুত হলেন ট্রামে ওঠার জন্মে।

এমনি ভাবে একে একে যে যার চলে যাচ্ছে। যারা নিজেদের গাড়িতে এসেছিল ইতিমধ্যে তারা সবাই প্রায় চলে গেছে, শুধু সেই অষ্টিনখানাই তখনো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ চুরুট টান্‌তে টান্‌তে থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে এলেন এক বাঙালী সাহেব। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দু'জনে হাস্য-পরিহাস করতে করতেই আস্‌ছেন। গাড়িতে উঠতে যাবেন, হঠাৎ ভদ্রমহিলা একেবারে শিউরে উঠলেন। আধো অন্ধকারে ঐ গ্যাসপোষ্টটার নীচে বসে লোকটা কী করছে? ডাষ্টবিন থেকে তুলে তুলে কি সব খাচ্ছে যেন? একটা কুকুরের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে চলেছে এই খাবারের জন্মে! বড্ড বিসদৃশ ঠেকলো এ দৃশ্য ভদ্রমহিলার চোখে।

ঃ এ লোকটাকে কিছু দাও না গো!—মানুষের চরম দুর্দশা দেখে বেদনাবোধ জেগে ওঠে মহিলার অন্তরে। তাই তিনি অনুরোধ জানান তাঁর স্বামীর কাছে বিপন্নকে কিছু সাহায্য করার জন্মে।

ঃ ন্যুইসেন্স, বীভৎস!—একবার লোকটার দিকে চেয়ে একথা বলেই চুরুটটা আরেকটু নিপুণতার সঙ্গে দুই ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরে সাহেবই তাড়াতাড়ি করে আগে আগে গাড়িতে উঠে পড়েন।

ঃ কী হলো, এসো!—সাহেব বিরক্ত হয়ে ডাকেন তাঁর স্ত্রীকে

তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠবার জন্যে। ভদ্রমহিলা অগত্যা সাহেবের পাশের সীটে যেয়ে উঠে বসেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটা যেন ঘুরে বেড়ায় ঐ লোকটাকে কেন্দ্র করে।

: আচ্ছা, দেবে না ওকে কিছু ?—অনুরোধের সুরে আবার প্রশ্ন করেন গৃহিণী।

ভদ্রলোক নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গেই পাতলুনের পকেট থেকে একটা আধুলি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন ঐ লোকটার দিকে। তার বিশ্রী মুখভঙ্গী দেখে গৃহিণী সাহস পান না আর কোন কথা বলতে।

আধুলিটা পায়ের কাছে পড়তেই চমকে ওঠে লোকটা। চক্‌চকে অর্দ্ধ টঙ্কাটি হাতে তুলে নিয়ে প্রথমটায় সে হেসে ফেলে। কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতেই যেমনি অষ্টিন গাড়িটার মধ্যে দেখতে পায় সে ঐ সাহেবকে অমনি মুহূর্তের মধ্যে তার আনন্দের রেশ কেটে যায়। তৎক্ষণাৎ সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঐ আধুলিটা সাহেবকে লক্ষ্য করে লোকটাকে বলতে শোনা যায়—

: ম্যানেজার, ফিরিয়ে নাও তোমার দান। আজ প্রায় দেড়মাস ধরে উপোষ করেই দিন কাটছে। দেহ আজ আর চলছে না বলেই এই অখাদ্য খেতে বসেছি। এ অবস্থা শুধু একা আমারই নয়, আমার মতো আরো অনেকের যাদের তুমি কারখানা থেকে বিনা নোটিশে তাড়িয়ে দিয়েছ। অপরাধ আমাদের—আমরা তোমার কাছে এ দুর্দিনে সারাদিনের মেহনতের বিনিময়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার মতো দিনমজুরী চেয়েছিলাম। তোমার আঘাত সয়েছি, কিন্তু করুণা সইবো না। তোমাকেও একদিন আমাদের মতোই হয়ত পথে নেমে আসতে হতে পারে ম্যানেজার। তখন বুঝবে অনাহারের কী তীব্র জ্বালা !

সাহেব ততক্ষণে তাঁর গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছেন। লোকটার কথা শেষ না হতেই গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কালে-কালে

'খবরের কাগজের খবরে বিশ্বাস নেই কোন। ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা যদি এখনো কোথাও হয়ে থাকে তো ঐ হাইকোর্টে, সেখানে কখনো এ ধরণের রায় দেবেন কোন বিচারপতি তা বাবা আর যে-ই বিশ্বাস করে করুক, আমি করতে পারি না।'

হলধর হালদার তাঁর বারান্দার রকে বসে তামাক টানতে টানতে আপন মনে বকে চলেছেন। ভাঁজ করা খবরের কাগজখানি পানের ডিবায় চাপা দেওয়া পড়ে আছে তাঁরই একপাশে। সকালবেলার নিত্যকার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রতিবেশী যে দু'জন বন্ধু এসে হালদারকে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে খবর শুনিয়ে যান সেদিনও তাঁরা যথারীতি এসেছিলেন এবং কাগজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা-মত চা-পান-তামাকে পরিতৃপ্ত হয়ে সবেমাত্র স্থানত্যাগ করে গেছেন।

হালদার মশাই পাড়ার খুড়ো। এমনকি ওঁর বন্ধুজনেরাও ওঁকে খুড়ো বলেই ডেকে থাকেন, ছেলে-ছোকরারাও তাই। কেউ খুড়ো বলে না ডাকলেই বরং ওঁর মনে ব্যথা লাগে। এমনও দেখা গেছে যে, কেউ হয়তো 'হালদার মশাই, প্রণাম হই' বলে সসম্মানে তাঁকে নমস্কার, জানালো, তিনি তাতে খুশি না হয়ে উল্টো অভিযোগের সুরেই বল্লেন 'কেন বাবা, বুড়ো লোকটাকে নাম ধরে না ডেকে খুড়ো বলে ডাকতে বাধাটা কোথায়, আর লজ্জাটাই বা কিসের?' তখন সে বেচারার পক্ষে চুপ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে কিছু? এমনি করেই

জোর করে 'খুড়ো' ডাকটাকে তাঁর একইরকম ট্রেড-মার্কা করে নিয়েছেন হলধর হালদার।

লেখাপড়ায় বর্ণপরিচয় পর্যন্ত না পৌছলেও খুড়োর তাতে আটকায়নি কিছু। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেক হালদার পরিবারেরই কিছু না কিছু স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা রয়েছে আগে থেকেই। তা ছাড়া সেই ছোট বেলা থেকে লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায়ে ঢুকে প্রচুর পয়সার মালিক হয়ে পড়েছেন তিনি। লোহার বাজারে সব সময়ই কাঁচা পয়সা। তার ওপর দু-দু'টো যুদ্ধ! সে কী সহজ ব্যাপার! এন্তার পয়সা এসেছে খুড়োর ঘরে, কিন্তু বেরুবার তো পথ পায়নি তেমন। তাই পয়সার ঝগড়া এখন লেগেই আছে ঘরে। আর সে কারণেই বাইরে বসে সময় কাটানো নিরাপদ বলে রককেই আজকাল প্রায় পাকাপাকি-ভাবে আশ্রয় করে নিয়েছেন হালদার মশাই।

সকাল-বিকেলে খুড়োর সঙ্গী ঐ তাঁর নির্দিষ্ট দু'জন প্রতিবেশী বন্ধু। তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট বরাদ্দ দু'বেলায় চার কাপ করে চা আর চারটে করে পান। কোন অজুহাত দেখিয়েই তার বেশী কিছু আদায় করা দুষ্কর—শুধু দুষ্কর নয়, একেবারে অসম্ভব। আর এও যে কোনরকম ভদ্রতা বিচারের পরিচায়ক তা মোটেই নয়, এ পুরোপুরি একেবারে হিসেবের ব্যাপার। খবরের কাগজ পড়ে শোনানো আর দৈনিক জমা-খরচটা মিলিয়ে দেওয়া, এ দু'টো কাজ যখন করিয়ে নেওয়া হয় এ দুই বন্ধুকে দিয়ে তার বিনিময়ে চা-পান-তামাকের বরাদ্দটা লোকসানের নয়, এ হিসেবটা মনে মনে কষে নিয়েছেন খুড়ো একেবারে সুরু থেকেই।

হ্যাঁ, যে খবরটা নিয়ে খুড়ো সেদিন নিজের মনেই নিজে আলোচনা করছিলেন তা' হলো পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মেয়েদের পক্ষে অপরাধ কিনা তা নিয়ে কোন এক হাইকোর্টের রায়। এরূপ ঘনিষ্ঠতা অপরাধ

নয়, রায়ে নাকি একথাই বলা হয়েছে। কিন্তু খুড়ো তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

: দূর, এ হতে পারে কখনো? নীতি-ধর্মের স্থান এখনো যদি এদেশে কোথাও থেকে থাকে সে ঐ হাইকোর্ট। সে হাইকোর্ট এমনিতর রায় দিয়ে আজকালের ছেলেমেয়েগুলোর ঘোলানো মাথা আরো ঘুলিয়ে দেবে, এ হতেই পারে না—অসম্ভব! এসব খবরের কাগজ-ওয়ালাদের মন-গড়া লেখা, জানলে সুরজিৎ!

কাগজের পাঠক সুরজিৎ সোমকে এই বলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন হালদার। কিন্তু সোম মশাই তাতে সায় দিতে পারেন না।

: আরে কী যে বলছ খুড়ো তার ঠিক নেই। বানানো কথা ছাপলে সে খবরের কাগজ আর চলতে পারে কখনো? আজগুবি খবর দু'দিন পেলে তিন দিনের দিন তুমিই কি আর দশ পয়সা খরচ করে কাগজ কিনবে, বল'তো? তা ছাড়া একেবারে হাইকোর্টের রায় নিয়ে গবেষণা, সে একদম অসম্ভব ব্যাপার। তেমনি ব্যাপার করতে গেলে পত্রিকার অফিসের দরজায় তালা-চাবি পড়ে যাবে, বুঝলে খুড়ো!

: তুমি আবার খবরের কাগজের লোক হলে কবে হে সুরজিৎ? আর তা নইলে এতো কথা জানবেই বা কি করে, তাও তো বুঝতে পারছি না।

: অতো কথা তোমার জানার কোনই দরকার নেই খুড়ো। তবে এটুকু তুমি জেনে রেখো যে, সংবাদপত্রের অফিসে কেমন করে কাজ চলে তার অনেক খবরই আমি রাখি। আমার এক পিসেমশাই ছিলেন সাংবাদিক, জানো খুড়ো। তাঁর সঙ্গে আমি অনেকদিন যেয়ে তাঁদের অফিসের কাজ দেখেছি। গাদাগাদা সব সংবাদ আসছে নানা-

দিক থেকে, আর সেগুলো সাংবাদিকরা মিলে সব ঠিকঠাক করে, সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন পর দিনের কাগজে বার করার জন্যে। উঃ সে কী ঝকমারি, আর হয়রানীর কাজ তা আর কি বলবো? সকাল বেলা এই যে কাগজখানা তোমার আমার নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে তার পিছনে যে কতো কষ্ট আর চিন্তা রয়েছে তা আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কল্পনার বাইরে, বুঝলে খুড়ো। কাজেই খবরের কাগজের লোকদের এমনি নস্যাৎ করা অন্যায়, এ কথাটা মনে রেখো। কি বল হে সোমেশ্বর?

সোমেশ্বর স্বভাবতই সুরজিৎকে সমর্থন করেন। মাষ্টার মানুষ, লেখাপড়ার কারবারী—লোহা-লক্কড়ের তো আর নয়। কিন্তু তা হলে কি হবে, সুরজিতের পক্ষ হয়ে দু'টো কথা বলতে যাবেন সোমেশ্বর আর অমনি বাধা আসে হলধর হালদারের দিক থেকে।

ঃ আরে রাখ বাপু তোমাদের কথা। তোমাদের কাছে সবাই সাধু-সজ্জন। কিন্তু আমি বাবা সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝে নিয়েছি যে, হাইকোর্টের গুটি কয় লোক ছাড়া খাঁটিলোক আর দুনিয়ায় একরকম নেই বল্লেই চলে।

ঃ খুড়ো, তোমার একথার ওপর তো আর কোন কথাই উঠতে পারে না। কাজেই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা ভালো। আজ যাওয়া যাক্ তা হলে।

এই বলে সুরজিৎ সোম আর সোমেশ্বর শিকদার চলে যাবার পর থেকে সেই হাইকোর্টের রায় নিয়েই কেবল মাথা ঘামাচ্ছিলেন হালদার খুড়ো। 'সত্যি সত্যি যদি এই রায় দিয়ে থাকে হাইকোর্ট, দেশের ছেলেমেয়েগুলোর দফা শেষ হয়ে যাবে তা হলে!'—এই দুশ্চিন্তা কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে খুড়োর মগজে।

তার পরের দিনের কথা। ভোর হতেই যথারীতি নিত্য-সঙ্গীদ্বয় এসে হাজির হালদার খুড়োর রকে।

ঃ কিহে সোমেশ্বর ভায়া, তুমিতো দেখছি আগেই এসে পড়েছ আজ। জোর খবর কী আছে আজকের ?—সুরজিৎ তাঁর পায়ের চটি খুলে বারান্দায় উঠে বসতে না বসতেই প্রশ্ন করেন তাঁর বন্ধুকে। কিন্তু সোমেশ্বরও এসেছেন হয়ত আধ মিনিট আগে এবং কাগজের খোঁজ করাও হয়ে ওঠেনি তাঁর পক্ষে তখন পর্যন্ত।

ঃ কাগজই আজ আসেনি এখন অবধি, কী আর জোর খবর তোমাকে শোনাবে সোমেশ্বর। তুমিতো আবার কাগজওয়ালাদের পক্ষের লোক। কাল যে গালমন্দ করেছি একটু তাদের, সে খবরটা আবার পৌঁছে দিয়ে এসেছ কিনা কাগজের অফিসে, তাই বা কে বলবে? তা নইলে এতো দেরী হবার কী কারণ থাকতে পারে বল তো! এমন তো আর কোন দিন হয় না!

খুড়োর কথা শেষ হতে না হতেই ছুটতে ছুটতে এসে হকার একখানা বাংলা কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার দৌড়তে শুরু করে। 'এতো দেরী কেন আজ?'—একটু থেমে এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তরটুকু পর্যন্ত দেবার সময় নেই তার। তাই দৌড়ের মুখে সে শুধু এটুকুই জানিয়ে যায় 'কল্ রাত মে মেসিন বিগড় গ্যয়া, ইস্‌লিয়ে থোরা দের হুয়া হুজুর!'

ঃ এক একদিনের খবরের কাগজ বার করতে যত রকমের ঝকমারি পোয়াতে হয় তার মধ্যে এই মেসিন বিগড়ানোর হাংগামা হলো সব চেয়ে বড় ঝকমারি। আসল রোটারি মেসিনখানাই বিগড়ে গিয়েছিল কিনা জানিনে, তবে তাই যদি হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যদি সে মেশিন রাত্রির মধ্যে মোটেই চালু না করা যেতো তা'হলে তো তুমি

আদৌ আর এ কাগজখানা পেতেই না। তোমাকে বাধ্য হয়েই হয় অন্য কাগজ কিনতে হতো, আর না হয় আজকের মতো দুনিয়ার খবর শোনা বন্ধই রাখতে হতো।

হকারের উত্তরের ওপর হালদারকে লক্ষ্য করে এতগুলো কথা বলতে বলতে ছুঁড়ে দেওয়া পত্রিকাখানি তুলে নিয়ে সুরজিৎ ভাঁজ খুলে ধরতেই কাগজখানার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একখানা ছবি চোখে পড়ে যায় হালদারের। আর অমনি তিনি লাফিয়ে উঠেন একেবারে উন্মাদের মতো।

: আরে গৌরাংগের ছবি উঠেছে কাগজে, গৌরাংগের ছবি! পড় পড় সুরজিৎ, তাড়াতাড়ি পড়ে শোনাও কী ব্যাপার! কাগজখানা সুরজিতের হাত থেকে টেনে নিয়ে আংগুল দিয়ে গৌরাংগের ছবি দেখিয়ে দেন হালদার এবং খবরটা তাকে পড়তে বলতে বলতে অনিশ্চয়-তার উদ্বেগে যেন হাঁপিয়ে উঠেন।

খবরে প্রকাশ: শ্রীগৌরাংগ হালদার সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন বিলেতে এবং পরীক্ষায় এতই ভাল করেছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসগোর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম তাঁকে খুব বেশী মাইনে দিয়ে একটা সেক্সনের ইন-চার্জ করে নিয়েছে। তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রী বোম্বাইয়ের শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীও একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং সেই ফার্মেই তাঁর একজন সহকারী।

খবর শুনে একলাফে দোতালায় ছুটে যান হালদার।

: ওগো শুনছো, গৌরাংগ তোমার বিলেতের এঞ্জিনিয়ার! তোমার বৌমাও নাকি তাই, আবার একই সঙ্গে নাকি ওরা ঐ দেশেরই কোন একটা কারখানায় এঞ্জিনিয়ারি করে। বলছিলাম না, পালিয়ে গেলেও পিছিয়ে পড়ে থাকায় ছেলে নয় আমার গৌরাংগ!

ঃ হ্যাঁ, কতই বলেছিলেনা তুমি ? ছেলেটাকে পয়সা পয়সা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন আবার বড় বড় কথা, 'বল্‌ছিলাম না.........' !

গিন্নী রোগশয্যা থেকেই মুখ ঝামটা মেরে উঠেন হালদারের কথায়। কিন্তু কর্তা খবরের কাগজ খুলে ছেলের ফটো দেখাতেই একেবারে জল হয়ে যান তিনি। তাঁর রোগ-বিবর্ণ মুখে হাসি আর ধরে না যেন।

ঃ আচ্ছা, খোকা কি সত্যি বে' করেছে ? তুমি যে বল্লে বৌমার কথা !

ঃ তা' হয়তো করে থাকবে! হাইকোর্টই নাকি রায় দিয়েছে, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় অপরাধ নেই কিছু। তা'হলে ছেলেমেয়েদের এমনি করেই বে'-থা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

ঃ যাও, তোমার এতো সব বক্তৃতা শুনতে চাইনি আমি। খোকা বৌমাকে নিয়ে কবে পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসবে তার বলতে পার কিছু ?

ঃ তা' আমি কী করে বলব ? আচ্ছা দাঁড়াও। ও সুরজিৎ, ও সোমেশ্বর! তোমরা আছ তো বাবা। খবরটা আর একবার পড়ে দেখতো খোকার বাড়ি ফেরার কথাটা আছে কিনা কাগজে !—খবরের কাগজখানা হাতে করে এই বলতে বলতে উর্দ্ধশ্বাসে আবার নেমে আসেন দোতলা থেকে হালদার খুড়ো।

ঃ প্রথমবারেই তো পুরো খবরটা পড়ে শোনালাম। আবার পড়ে কী আর নতুন খবর শোনাব তোমাকে ?—খুড়ো নেমে আসতেই সুরজিৎ তাঁর কথার উত্তর দেয় এই ভাবে।

ঃ তাতে কী হয়েছে ? ছেলেটার যখন একটা খবর পাওয়া গেল,

পড়ই না বাবা একবারের যায়গায় দু'বার তাতে কীই বা এমন ক্ষতি হয়ে যাবে তোমার, তাতো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা যাক্, নাই বা আর পড়লো সুরজিৎ—তুমি খবরটা একবার পড় দেখি সোমেশ্বর, আর একবার শোনা যাক্।

আর একবার পড়ে খবরটি শোনালেন অবশ্য সোমেশ্বর মাষ্টার, কিন্তু গৌরাংগের বাড়ি ফেরার নাম গন্ধও নেই সেখানে।

ঃ খবরটা আবার কাগজের আফিসে বসে তৈরী করা নয়তো হে সুরজিৎ! কোথাকার বোম্বাইয়ের কে এক রুক্মিণী দেবীকে বিয়ে করে ফেলবে আমার গৌরাংগ, এ আমি ভাবতেই যে পারছি না।

ঃ কালে কালে আরো কত কি হবে, তার কতটুকুই বা তুমি ভাবতে পারছ, বলো। কিন্তু যে কাগজ তোমাকে তোমার চার বছর আগে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটার সন্ধান এনে দিল, কোথায় সে জন্যে তুমি কৃতজ্ঞতা জানাবে, তা' না করে খবরের কাগজওয়ালাদের কাজে সন্দেহ আরোপ করছ তুমি, এ কিন্তু ভারি দুঃখের কথা খুড়ো!—এই বলে হালদারকে একটু লজ্জা দেবার চেষ্টা করেন সুরজিৎ এবং সোমেশ্বরকে নিয়ে বিদায় নেন। তাঁর আজ একটু তাড়াতাড়ি। আবগারির দারোগা, বাইরে ইন্সপেক্শন ডিউটিতে বেরুতে হবে।

খোকার ফেরবার কথাটাই জানা গেল না!—এই ভাবতে ভাবতে আবার ওপরে উঠে যান হালদার।

ঃ কী, আসবে ওরা শীগ্গির ফিরে?—গিন্নী জিজ্ঞেস করেন গভীর আগ্রহ নিয়ে।

ঃ আমার কি মনে হচ্চে গিন্নী, জানো? যে বারো হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে খোকা, সে বারো হাজার টাকা না নিয়ে সে ফিরবে না কিছুতেই সে যে জেদী ছেলে! কি বলো গিন্নী?

: তোমার তো কেবল টাকা আর টাকা! ছেলের জন্যে তোমার দুঃখই ভারি! টাকার শোকই যে ভুলতে পারে না ছেলে তাঁর ফিরে আসুক আর না আসুক তাতে ভারি যায় আসে তাঁর!—এই বলে গিন্নী সেই যে পাশ ফিরে শুলেন আর মুখ ফুটে কোন কথা বল্লেন না।

পচাই

ভাগ্যকে আজ ধন্যবাদ দেয় ভিখু। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মুনিষ খেটে অনেকদিন পর আজ সে বেশ কিছু পয়সা পেয়েছে।

চাষের সময় পরের জমিতে লাঙল চাষ রোজই কিছু না কিছু রুজি-রোজগার হয়ে থাকে। কিন্তু এই অকালে ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। মুনিষের কাজ কোন কোন দিন হয়তো পাওয়া যায়, অনেকদিন একেবারেই পাওয়া যায় না। সংসার অধিকাংশ দিনই অচল, উনুন ধরাবারও উপায় থাকে না। ভিখু তাই বাইরে থেকে ভুলে থাকতে চায় তার ঘরের দুঃখ। অনেক সময় আবার ভাবে, আমরা কোনাই—আমাদের মতো বাউরী, লেট, বাগ্দী এবং সাঁওতালরা—যারা ছোটই আছি, লেখাপড়া শিখিনি—আমরাও তো মানুষ, তা'হলে মানুষের মতো চারটি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ আমাদেরইবা হবে না কেন? কিন্তু সে শুধু ভাবাই!

আজ প্রাপ্তিযোগটা একটু বেশি হওয়ায় ভিখুর আনন্দ আর ধরে না। খরচের হিসেবটাও সে করে ফেলে মনে মনে। বউ-এর জন্যে আর খোকার জন্যে ক্ষুদিরাম ঘোষের মিষ্টির দোকান থেকে দুটো 'রোজেট' নিয়ে যেতেই হবে। সারাদিনের শ্রম বা ব্যর্থতার অবসাদ নিয়ে সে যখন অনেক রাত্রিতে ঘরে ফেরে তখন তার অর্ধাশনক্লিষ্ট বউ-এর আদর আর তার তিন বছরের খোকার ঘুমন্ত চোখের গভীর ভালোবাসার বিনিময়ে সে তো তাদের কিছুই দিতে পারেনি। চেষ্টা

সে করেছে, কিন্তু ঘরকে খুশি করার তীব্র আকাঙ্খা তার বার বার চুরমার হয়ে গেছে! তবু সামান্য সাফল্যে অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে সে মাঝে মাঝে। সে সব সাফল্যের দিনগুলোর কথাই আজ আবার তার মনে পড়ে যায়। আজ যখন সে বিখ্যাত মিষ্টি 'রোজেট' আর ট্যাঁক থেকে টাকা খুলে বউ-এর হাতে দেবে তখন বৌ তার কী খুশিই না হবে! নিশ্চয়ই আগের সব দিনের চেয়ে বেশি খুশি হবে সে। এই ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভিখু।

অভ্যাসবশে ভিখু কিন্তু পচাইখানার দিকে পা না বাড়িয়ে পারে না। বাঃ রে, সারাদিন ধরে এতো খেটেখুটে সে একটু স্ফূর্তিও করবে না! একাই এক হাড়ি পচাই কিনে নিয়ে সে ব'সে পড়ে পচাই-এর আড্ডায়। বেশ জলুব করে ঢোকে ঢোকে সে গিলে সেই দুর্গন্ধ পানীয়, হাঁড়িতে চাটি মেরে বাজনা বাজায়, আধা অস্পষ্ট স্বরে অশ্লীল গানেরও দু' একটা কলি গাইতে সুরু করে দেয় মাঝে মাঝে। আবার থেমে যায়। যতো সময় যায় ততোই বেহুঁস হয়ে প্রচুর পরিমাণে পচাই গিলতে থাকে ভিখু। হাঁড়িটা নিঃশেষ হয়ে গেল তবে নিশ্চিন্ত।

কানের পিঠ থেকে আধ পোড়া একটা বিড়ি বার করে পাশের পান-বিড়ির দোকানের গায়ে লট্‌কানো অগ্নিমুখী দড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে এগিয়ে চলে ভিখু। চলার তাল ঠিক থাকে না তার। চল্‌তে চল্‌তে দুই হাঁটুতে ঠোকর লেগে যায়, টল্‌তে টল্‌তে পড়ে যাবার উপক্রম হয় এক একবার। তবু সে চলে, ঠিক পথেই এগিয়ে চলে সে তার অভ্যাসমতো ছুটোপট্টির দিকে।

বিপরীতমুখী হলেও খ্যাতির দিক থেকে রামপুর হাটের 'রোজেটে'র চেয়ে কম নাম ডাক নয় এ ছুটোপট্টির। কৌলিন্যে কলকাতার সোনাগাছি বা রামবাগানের সঙ্গে তুলনা চলে। আর সত্যি কথা

বলতে কি, এতো পচাই আর দেশী মদের দোকান এবং এ পট্টির অপূর্ব পরিবেশে যে নরক-গুলজার জমে এখানে তার জুরি মেলা ভার। এ অঞ্চলের সমস্ত মেয়ে-পুরুষতো বটেই, প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত ভিখুর অতি পরিচিত। ছুটোপট্টির মাটিতে পা পড়তেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আজো আগের মতোই শিহরণ জাগে ভিখুর এ পাড়ায় ঢুকে। মাটির ঘরের দোরে দোরে সুন্দরীরা সব সেজেগুজে কেউ বসে বা কেউ দাঁড়িয়ে। দূর থেকে ময়নাকে চোখে পড়ে ভিখুর। কেমন একটা মোচর লাগে তার বুকটার মধ্যে। খালি বুকটা একবার হাতড়িয়ে ট্যাঁকে গোজা পাঁচসিকে পয়সা হাতে অনুভব করে নেয়, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিখু।

যাবে আজ ময়নার ঘরে? ট্যাঁকটা বেশ ভারি আজ, অনেক রাত পর্যন্ত স্ফূর্তি করা যাবে। খুশিতে ঝল্‌মল্ করে ওঠে ভিখুর মুখ। পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় বৌ-এর বিষাদ-মলিন চেহারা, বেটার টলটলে চোখের চাউনি। সে না 'রোজেট' নিয়ে যাবে আজ ওদের জন্যে! টাকা নেওয়ারও তো দরকার। ছেলেটা বেদম ভুগছে আজ কদিন ধরে।

পথের মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়ায় ভিখু। ময়নার কথা মন থেকে যে সরাতে পারে না সে। সেই ময়না। পড়ন্ত শীতে সিউড়ী শহরে বড়-বাগানের মেলায় বছর তিনেক আগে প্রথম সে দেখেছিল তাকে তার মাসির সঙ্গে। বয়স তখন ময়নার তের কি চৌদ্দ। সেই সময়ই ভাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল ভিখুর ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন সে মোটেই পাত্তা পায়নি সেখানে। বড় খদ্দরের আশায় মাসি ওর কালসমুদ্রে ঢেউ গুনছিল! গুনুক! ক্ষুদ্ ছড়ালে কাকের অভাব? বীরভুমের মেলায় কতো সুন্দরীই তো বসে তাদের দেহের পসরা সাজিয়ে। ময়নাকে না পেলেও কম পয়সায় মনের সখ মেটাতে সেদিন ভিখুর কোনই বেগ পেতে হয়নি।

তবু এ মেয়েটার ছবি যেন তার মনে গেঁথেই রয়ে গিয়েছিল। প্রায় বছরখানেক পর এ মেয়েটারই সঙ্গে আবার তার দেখা হয়েছিল শ্যামচাঁদের মেলায়। শ্যামচাঁদের মেলা বছরে বছরে জায়গা বদলায়। সেবারের মেলায় অভিভাবকত্বের কোন বালাই ছিল না ময়নার। মাসির মৃত্যুর পর থেকে সে চালিয়ে আসছে তার স্বাধীন ব্যবসা। পসার ভালোই জমিয়েছে। ব্যবসার খুঁটিনাটি সে বেশ ভালো করেই শিখে নিয়েছে মাসির কাছ থেকে।

সেবার মেয়েটাকে শ্যামচাঁদের মেলায় একা পেলেও, ভিখু কিন্তু খালি হাতে তার কাছে যেতে ভরসা পায়নি। ভারি চমৎকার একটা পুতুল কিনে নিয়েছেল সে সঙ্গে। খুবই খুশি হয়েছিল ময়না সেই মাটির পুতুলটি পেয়ে। আদর করে তার ঘরে নিয়ে বসিয়েছিল সে ভিখুকে। সেই থেকেই কেমন যেন একটা রং ধরে গেছে ভিখুর মনে। সময়ে অসময়ে তার দেখতে ইচ্ছে হয় ময়নাকে। এখন তো তার কাছে যেয়ে দু' এক ঘণ্টা রোজ কাটিয়ে না এলে প্রাণটাই আন্‌চান্ করতে থাকে।

রোজ পাওয়ার জন্যেই তো ময়নাকে এনে রামপুরহাট বাজারের ছুটোপট্টিতে যায়গা করে দিয়েছে ভিখু। আগের বছর কার্তিক মাসের তারাপীঠের মেলায় রাজি করানো যায়নি তাকে রামপুরহাটে ঘর বাঁধতে। তারপর বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলায় ভিখু অনেক করে, অনেক ভালো ভালো খদ্দেরের লোভ দেখিয়ে তবে না তার মত পেয়েছে!

ছুটোপট্টিতে যে নতুন মাটির ঘর তুলে নিয়েছে ময়না পুরো এক বছরও তার হয়নি। দেবতার দৃষ্টি আছে তার ওপর। দেবতাদের ফটো দিয়ে সে সাজিয়েছে তার ঘর। বাইরে সামনের দুই মাটির দেয়ালে লোক-শিল্পের অপূর্ব স্বাক্ষর! একদিকে ময়ূরপৃষ্ঠে ধনুর্বানধারী

দেব-সেনাপতি কুমার কার্তিকেয় এবং অপরদিকে গোপিনী-বস্ত্রহরণে উল্লসিত বৃক্ষোপরি বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ পথিকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একেবারে নতুন জায়গায় এসেও এরই মধ্যে ময়নার পসার বেশ জমেছে। ঠাকুর দেবতার ওপর তাই তার বিশ্বাসও খুব বেশি। এদিকে সপ্তদশ বসন্তের ঢেউ যে খেলে চলেছে তার দেহ-সমুদ্রের ওপর দিয়ে সে খেয়াল তো আর তার নেই! ভিখু কিন্তু তার কথা রেখেছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকেও সে খদ্দের করে দিয়েছে ময়নার। এ জন্যেই তো রূপোপজীবিনীদের মধ্যে একটা আলাদা প্রেষ্টিজ দাঁড়িয়ে গেছে তার এরই মধ্যে। ভিখুর একটু বিশেষ খাতিরও তাই তার কাছে।

এতো খাতির সত্ত্বেও আজ কেন জানি ভিখু নিজের ভিতর থেকেই একটা বাধা পায় এগিয়ে যেতে। আধমরা ছেলেটার ডাগর ডাগর চোখ দুটোই বার বার ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। আজ তো সারা দিনে উনুনও ধরেনি। একেবারেই বাড়-বাড়ন্ত ঘর। বৌ সকালবেলা কতোক্ষণ ধরে ডাক-চিৎকার করছিল। ভিখু তাই শুনতে শুনতে সেই যে বেরিয়ে এসেছে আর কোন খবরই রাখে না। আর খবর রেখেই বা কি হবে? এতো আর একদিনের সমস্যা নয়, বছরের পর বছরের। সারা বছর খেটেও ছ' মাসের খোরাক পুরো জোটে না। টাকা-পাঁচসিকে বাড়ি নিয়ে গেলে তা' দিয়ে হয়তো সেরটেক চাল জোগার করা যাবে। কিন্তু তাতে লাভ? সে চালের ভাত কী করেই বা তারা খাবে? যে চালের গুঁড়োর অভাবে কাঁকড়-গুঁড়ো মিশানো গম-গোলা খাইয়ে ছেলেটাকে তারা মেরে ফেলতে বসেছে, সে চালের ভাত যাবে তাদের পেটে? তার চেয়ে স্ফূর্তি করে যা আছে তার সবটা খরচ করে ফেলাই ভালো।

নেশার ঘোরে এমনি ধারা ভাবতে ভাবতে ঝক্ ঝকে নয়া মাটির ঘরটার দিকে এক পা এগিয়ে যায় ভিখু, আর পরক্ষণেই দু'পা পিছিয়ে আসে। হঠাৎ বারান্দায় টাঙানো খাঁচার ভিতর থেকে টিয়াটা 'জয় রাধে-কৃষ্ণ' বলে ডেকে ওঠে আর ময়নার চোখ পড়ে যায় ভিখুর ওপর, সে অবাক্ হয়ে যায় তার কাণ্ড দেখে।

ঃ বুলি, মিন্সের ঢং ছাখো না!

ঃ হবে না ক্যানে, উতো তুমার রসের লাগর। ঝ্যাটা মার পোড়ারমুখোকে! —ময়নার কথার জবাবে পাশের ঘরের রূপসী বাঁদিকে স্তূপীকৃত ছাইপাশের ওপর পচ্ করে একগাল পানের পিক্ ফেলে ঈর্ষার আগুন ছড়ায় এই বলে। ভিখুর ওপর ওদের রাগের অন্ত নেই। ময়নাকে যে সে মনের মতো খদ্দের জুটিয়ে দেয়।

ভিখুর কানেও গিয়ে পৌঁছে ময়না এবং তার প্রতিবেশিনীর কথা। কিন্তু সে আর আজ দাঁড়াতে পারে না সেখানে। তার যেন মনে হয়, তার বেটার হাত-পা-দেহটা সবই মরে গেছে, শুধু চোখ দুটো এখনো বেঁচে আছে। সেই টল্‌টলে চোখ দুটো দেখার জন্যেই সে ছুটে যায় বাড়ির দিকে।

মোড় ফিরেই তমালগাছের তলায় বাবাজীদের আখড়া। গুড়ের চা-এর গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকের বাতাসে। ঐতো নাকের রসকলি দুলিয়ে বৈষ্ণবী অভ্যর্থনা করছে এক বাবুকে চায়ের বাটি এগিয়ে দিয়ে। বাবাজীর গুপীযন্ত্রে সুরু হয়ে যায় 'গুপ্ গুপা গুপ্— গুপাৎ গুপাৎ' আর বৈষ্ণবী ধরে একতারা। মিলিত কণ্ঠে বীরভূমের বাউল আর চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তন শুনে মোহিত হয়ে যান আগন্তুক। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না তখনো যে, কতো দক্ষিণান্ত হয়ে তাঁকে ছাড়া পেতে হবে আখড়া থেকে।

পথ চল্‌তে চল্‌তে লণ্ঠনের আলোয় ভিখুর চোখে পড়ে বৈষ্ণবীর হাসিখুশি মুখ আর ঐ নরাগত মুগ্ধ বাবুকে, গুপীযন্ত্রের ধ্বনিও তার কানে ভেসে আসে বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে। কিন্তু আজ আর সে থামে না, ফিরেও তাকায় না আর একবার। নেশা খানিকটা কেটে এসেছে এতোক্ষণে। নিজের ঘরের পিছনে এসে থম্‌কে দাঁড়ায় ভিখু। বৌ কাঁদছে ? ভিখু মাটির ঘরের জানালার ধারে কান পেতে থাকে খানিকক্ষণ। না, ও তার মনের স্বপ্ন! সেদিন সে যে অন্যায় করেছে, সেই থেকে, বৌ আর একটিও কথা বলেনি তার সঙ্গে। ছেলেটা যদি ভালো থেকে থাকে তা' হলে এই টাকা পেলেই বৌ হয়তো অনেকটা খুশি হয়ে যাবে। গোটা দুয়েক রোজেট নিয়ে এলে আরো ভালো হতো। যাঃ, রোজেটের কথা একেবারেই ভুল হয়ে গেছে তার!

এমনি সব ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকেই ট্যাঁক থেকে খুলে একটা রূপোর টাকা আর দু'টো দু'আনি হাসিমুখেই ঝণাৎ করে ফেলে দেয় সে বৌ-এর পায়ের কাছে। পাশেই তিন বছরের ছেলেটা তখন ধুক্‌ছে।

ঃ আমার টাকা চাই না। আমার বাসন লিয়ে এসো। ছেলেটা বেহুঁস, ঘরে নাই কানাকড়ি। চিকিচ্ছা করবার লেগেই তো থালাটো ঘটিটো বন্দক দিতে দিনু সেদিন। সেই বন্ধকের ট্যাকা, ছেলের চিকিচ্ছের ট্যাকা তুমি নিশ্চিন্দি শুঁড়িকে দিয়ে এলে ? আর চোখের সামনে ছেলেটা আজ মরছে। তুমি না বাপ!

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপ! বাপতো হইছে কি ? বড় ত্যালান ত্যালাইছিস্। বুলছি এখন খিটকেল করিস্ নি, মার খেয়ে মরবি।—বৌ-এর কথায় পৌরুষে আঘাত লাগে ভিখুর, সে তার জবাবে গর্জে ওঠে এই বলে।

ঃ মার না দেখি মিন্‌সে! বলে ভাত দেবার ভাতার লয়, কীল

মারবার গোঁসাই!—বৌও সহজে চুপ করে যাবার পাত্র নয়। না খেয়ে খেয়ে, দুঃখে ব্যথায় খিট্‌খিটে হয়ে গেছে তার মেজাজ। সেও রুখে দাঁড়ায়।

: তবে রে হারামজাদি!—পচাইয়ের রং চড়ে যায় মুহূর্তের উত্তেজনায়। মত্ত ভিখু পাশ থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে বৌকে দমাদ্দম দু'ঘা মেরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পিছন ফিরে একবার তাকায় ও না আর।

ভিখু আর ঘরে ফেরে না সে রাত্রিতে। পরদিন সকাল বেলা এসে দেখে ছেলেটা ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে সেই ছ্যাড়া কাথাটার ওপর আর ঐ পাঁচসিকের পয়সা তেমনি ছড়ানো রয়েছে এক পাশে। অদূরে বটগাছের ডালে গলায় কাপড় লাগিয়ে ঝুলছে বৌ। কপালে খানিকটা রক্ত জমাটবেঁধে আছে। এইসব ভিখুর চোখে পড়ে, কিন্তু কোন কিছুর দিকেই সে আর দ্বিতীয়বার তাকাতে পারে না।

ঘর থেকে পয়সাগুলো কোন রকমে কুড়িয়ে নিয়ে পচাইখানার দিকেই ভিখু আবার ছুটে যায়। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কেমন যেন একটা ঘরের আকর্ষণ অনুভব করে সে। সুখী সচ্ছল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন জাগে তার মনে।

ভিখু থমকে দাঁড়ায় পথের মাঝখানে।

হারানো-প্রাপ্তি

এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা, দুই কড়ায় অর্ধ গণ্ডা, তিন কড়ায় তিন পোয়া গণ্ডা···।

ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শেষ ঘণ্টায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সুরু করে কড়াকিয়া পড়তে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুলেখা গাঙ্গুলী।

দিদিমণির ছুটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দধ্বনিতে আকাশ ভেঙে পড়ে আর কি! কচি-কাঁচা সব ছাত্র-ছাত্রীরা শ্লেট-বই বগলদাবা করে দে-ছুট যে যার বাড়ির দিকে। ছুটির আনন্দের কি তুলনা আছে?

চন্দ্রনাথের দোকানের সমুখ দিয়েই আসে যায় বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে। চন্দ্রনাথ নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। কেউ আসে এক পয়সার পেন্সিল কিনতে, কেউ চায় এসে দু' পয়সা দামের বর্ণবোধ। চন্দ্রনাথ তাদের সবার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা কয়। সে বুঝতে পেরেছে এতোদিনে যে, মতিমালার এই ইস্কুল তাকে শুধু ধ্বংসের পথ থেকেই রক্ষা করেনি, বহুর মধ্যদিয়ে ফিরিয়ে এনেছে তার শংকরকে।

* * *

মস্ত বড়ো নর্দমা। সর্বক্ষণ জলের স্রোত বয়ে যায় তাই রক্ষে, তা' না হলে টিকে থাকাই দায় হতো এর পাশে।

নর্দমার পার ঘেঁষেই একসারি মাটির ঘর। প্রায় সব কয়টি ঘরের সঙ্গেই এক একটি করে ছোট ছোট দোকান। এ সব দোকানের মধ্যে কোনটি মিষ্টির, কোনটি দর্জির, কোনটি বা মনিহারী।

এমনি একটা মনিহারী দোকানেরই মালিক চন্দ্রনাথ। খুব কায়-ক্লেশেই তার সংসার চলে। মতিমালার সাহায্য না নিয়ে এই দোকানের আয়ে সংসার চালানো সত্যই তার পক্ষে অসম্ভব।

দোকান তো নামে মাত্র। কয়েক শিশি আলতা, চুলের কাঁটা আর ফিতা, সেফ্‌টি পিন, সূচ আর ডিম সূতো, বিড়ি, সস্তা দামের সিগারেট আর কয়েক বাক্স দেশলাই, দোকানের মালপত্র বলতে তো মোটামুটি এই। এ ছাড়া অবিশ্যি এক টিন এস বিস্কুট আর দু'টো হরলিকস্‌-এর শিশি ভর্তি লজেঞ্চুসও মাসের প্রথম ভাগে শোভা বর্ধন করে চন্দ্রনাথের দোকানের। কতোই বা আর এ থেকে আয় হতে পারে? তার ওপর চন্দ্রনাথের আবার কিছুকাল ধরে দেখা দিয়েছে একটু জুয়ার নেশা। এই নেশার জন্যেই মতিমালার সঙ্গে তার যতো ঝগড়াঝাটি।

: এই নাও, ছাখো কি এনেছি আজ তোমার জন্যে। সকাল বেলাতো রাগে ফেটে পড়ছিলে একেবারে একটা টাকা চেয়েছিলাম বলে। এখন ছাখো, সেই এক টাকায় কয় টাকার গয়না নিয়ে এসেছি। —আধা নেভানো লণ্ঠনটার আলো বাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্রনাথ মাদুরের ওপর ঘুমন্ত মতিমালাকে ডেকে তুলে রোল্ডগোল্ডের দু'গাছা রুলি আর একজোড়া কানপাশা এগিয়ে দেয় তার হাতে।

: খুব হয়েছে, মুড়িওয়ালীর আবার গয়না! আর একটা বৌ এনে গয়না পরাও গে তাকে। আমি গয়না পরলে ঝি-গিরি করবে কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, শুনি?

: কে বলেছে তোমায় ঝি-গিরি করতে?

: খুব হয়েছে! রেখে দাও তোমার বাহাদুরি। দশটা দিন যার সংসার চালাবার মুরদ নেই, তার মুখে আবার এতো বড়ো কথা!

: কী বল্লে?—মতিমালার কথায় চন্দ্রনাথ গর্জে ওঠে একেবারে।

ঃ কী আবার বলবো ? বলেছি এবং আবারও বল্‌ছি যে, আমি কি লাটসাহেবের গিন্নী যে ঝি-গিরি না করলে আমার খাওয়া-পরা জুটবে ? তোমার ক্ষমতা তো আর আমার জানতে বাকি নেই ! তোমার গয়না নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করগে তুমি, ওসবে আমার দরকার নেই কিছু।

মতিমালার এ উপেক্ষা আর শ্লেষ সহ্য করতে পারে না চন্দ্রনাথ। মাথাটার মধ্যে দপ্‌ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। লণ্ঠনটাকে একটা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই তার তেলচিটে বালিশটাকে টেনে নিয়ে জোড়া মাদুরের একপাশে যেয়ে গম্ভীর হয়ে শুয়ে পড়ে।

ঃ উঃ, রাগ দ্যাখো না মিন্‌সের। মাসভর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দিতে পারলেও না হয় বুঝতাম। কার পয়সার লণ্ঠনটা তুমি এমনি করে ভেঙে ফেললে, শুনি ?

কোন জবাব দেয় না চন্দ্রনাথ। ছেঁড়া কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে চুপ করে সেই যে পড়ে আছে, আর নড়াচড়াও করে না একটু। রাগ পড়ে গেলে সে বুঝতে পারে যে, লণ্ঠনটা ভেঙে ফেলা তার খুবই অন্যায় হয়েছে। কোথায় সে আবার পয়সা পাবে নতুন লণ্ঠন কিনে আনবার জন্যে ? খানিকটা কেরোসিনও তো নষ্ট হয়ে গেলো ! কণ্ট্রোলের কেরোসিন জোগাড় করাও কি কম মেহনতের ব্যাপার !

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে এমনিধারা ভাবে চন্দ্রনাথ। মতিমালা মনে করে ঘুমিয়েই বোধহয় পড়েছে সে। অতি সন্তর্পণে মতিমালাও যেয়ে পাশের মাদুরে শুয়ে পড়ে। সবই টের পায় চন্দ্রনাথ, কিন্তু টুঁ' শব্দটি না করে সটান পড়ে থাকে।

রাত তখন অনেক। কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না চন্দ্রনাথ। পাশ ফিরে শুয়ে আছে অনুতাপের আগুন সারাক্ষণ জ্বলছে তার মনে। পাশ ফিরে শুয়ে আছে

মতিমালা। সেও কি ঘুমোয় নি? একহাতে মতিমালাকে জড়িয়ে ধরে পরীক্ষা করতে চায় চন্দ্রনাথ।

: যাও!—জোর এক ঝাম্‌টা মেরে স্বামীর হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মতিমালা।

: রাগ করেছ? আমারই অন্যায় হয়েছে।—এই বলে চন্দ্র আবার তার ডানহাতখানা বাড়িয়ে দেয় মতিমালার বুকের ওপর।

: দূর ছাই, নিকুচি করি এমন ভালোবাসার। তেরো বছরের অমন ছেলেটা চলে গেল, তার জন্যে যার একটু চোখের জল দেখলাম না তিন বছরের মধ্যে, সে আবার পিরীত করতে আসে। লজ্জাও করে না!

এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না চন্দ্রনাথ।

: চোখের জলের কথা বলছ, মতি? কোথা থেকে জল আসবে? আমার শংকর যেদিন মোটর চাপা পড়ে মারা পড়লো ইস্কুলে যাবার পথে, আর সে দৃশ্য আমি যখন গিয়ে দেখলাম, সেই থেকে আমার চোখ দু'টো যে পাথরের হয়ে গেছে তাতো আর তুমি জান না, মতি! একবার চেয়ে ভাখো এদিকে।—এই বলে চন্দ্রনাথ টেনে তোলে মতিমালাকে।

মতিমালা চমকে ওঠে চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে। জমাট রক্তের দু'টো গোল লাল পাথর যেন জলছে চন্দ্রনাথের দুই চোখে। নির্বাক মুখোমুখি হয়ে দুজনে বসে থাকে কতোক্ষণ।

তারপর আবার পাশাপাশি দু'জনে শুয়ে পড়ে।

বস্তির ছেলে শংকর। তার মা চেয়েছিল ছেলে তার লেখাপড়া শিখে ভদ্দরলোক হবে, তাদের মতো সম্মান পাবে। চন্দ্রনাথ বলেছিল, কী হবে বেশি পড়া করে, হিসেবপত্রটা ভালো করে শিখে নিতে পারলেই দোকানটাকে সে বড়ো করে তুলতে পারবে। মায়ের আগ্রহে শংকর কিন্তু

লেখাপড়ার দিকেই খুব বেশি ঝুঁকে পড়েছিল এবং মাথাটাও ছিল তার খুবই ভালো। হাই ইস্কুলে প্রথম চারজনের মধ্যে সে থাকতোই প্রতি ক্লাসের পরীক্ষায়। ফ্রী ছাত্র হিসেবেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সে উঠেছিল এবং মাষ্টার মশাইরাও তাকে দিয়ে কতোই না আশা করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, গরীবের ছেলে হলেও শংকর হয়তো ম্যাট্রিকে একটা বৃত্তিও পেয়ে যেতে পারে। এ আশায় তার ওপর একটু বিশেষ নজর দেবার নির্দেশও ছিল হেডমাষ্টার মশাইয়ের। কিন্তু কী এক অভাবনীয় দুর্ঘটনায় সব গোলমাল হয়ে গেল!

শংকরও মাঝে মাঝে তার বাপ-মাকে এবং অনেক সময় তার বন্ধুদেরও বলতো যে, সে লেখাপড়া শিখে বড়ো হবে এবং গরীবদের উপকার করবে। দারিদ্র্য যে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ, এ কথাটা যেন সে খুব ছোট বেলাতেই অনুভব করেছিল। তার মা ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে পরের বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে, ছ'টাকা ছ'টাকা করে দু'বাড়ি থেকে বারো টাকা মাইনে আনে মাসের শেষে, এ বড্ড অপমানকর মনে হতো তার কাছে। দু'পয়সার বিস্কুট কিনতে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যখন সে শুনতো তার বাপকে তুমি বলে ডাকতে, রাগে দুঃখে একেবারে যেন ফেটে পড়তো শংকর। খুব ছোট থাকতেই সে একবার প্রশ্ন করেছিল তার মাকে—মা, লোকে গরীব হয় কেন? মতিমালা উত্তর দিয়েছিল—লেখাপড়া শিখেনা বলে অন্য লোকে তাদের ঠকিয়ে সব নিয়ে যায়, তাই তারা গরীব হয়ে যায়! মায়ের মুখ থেকে এই সোজা উত্তর পেয়েই শংকর সংকল্প করেছিল যে, সে লেখাপড়া শিখবে, বড়ো হবে এবং গরীবের উপকার করবে, তাদের যাতে কেউ ঠকাতে না পারে তাই দেখবে। কিন্তু তা' আর হলো না!

ঘুরেফিরে সে সব কথাই কেবল মতিমালার মনে পড়ে, আর চন্দ্রনাথ ভুলে থাকতে চায় সে বেদনাময় অতীতকে তার শ্রীহীন দোকানের দীন পরিবেশের মধ্যে ডুবে থেকে, বেলগাছিয়ার জুয়ার আড্ডার হট্টগোলে।

ভোর রাত্রির ট্রেণের শব্দেই প্রতিদিন ঘুম ভাঙে মতিমালার। সেদিনও ঠিক একই সময়ে ট্রেণের একটানা হুইসিল শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসে মতিমালা। কিন্তু বড়োই চিন্তায় পড়ে যায় সে। মেয়ে-জামাই-এর না আছে আসার কথা! সঙ্গে নাতি-নাত্‌নিও যে আসবে। বেশ খরচ-পত্রের ব্যাপার!

এই মেয়ে ছাড়া কে-ইবা আছে আর মতিমালার! ছেলেটা চলে যাবার পর এই মেয়ে-জামাই আর নাতি-নাত্‌নি নিয়ে কি যে করবে সে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। চন্দ্রনাথ তাকে ঝি-গিরি ছাড়তে বলে, কিন্তু ঝি-গিরি ছেড়ে দিলে এদের জন্যে যে সে কিছুই আর করতে পারবে না! বিকেলবেলা বাড়ি বাড়ি মুড়ি বিক্রি করে যে আয়টা করে মতিমালা, তা' সে জমিয়েই যাচ্ছে। প্রাণ গেলেও সে টাকায় সে হাত দিতে নারাজ। সেই গচ্ছিত অর্থে সে শংকরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে, এই তো তার সংকল্প। এ নিয়েই তো চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার রোজ রোজ যতো ঝগড়া-ঝাটি, যতো খিট্‌কেল। শংকরের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে কোনদিনই কোন উৎসাহ পায়নি সে চন্দ্রনাথের কাছ থেকে, বরং সে স্মৃতিকে সে ভুলে যাবার উপদেশই দিয়েছে বার বার মতিমালাকে। 'গরীবের ঘোড়া রোগ' হলে যে বিপদের আশংকা দেখা দেয়, সে হুসিয়ারিই কেবল শুন্‌তে হয়েছে তাকে। কিন্তু কোন উপদেশ বা সতর্কবাণীই মতিমালাকে টলাতে পারে নি, অবিচল নিষ্ঠায় সে শংকরের স্মৃতি-ভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছে কঠোর পরিশ্রমে। তার

মেয়ে-জামাইও এ ধরণের সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নয়, এও সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু নাইবা আসুক সমর্থন তাদের কাছ থেকে, তাতে কি এমন যায় আসে? সে একাই তার সংকল্পকে সার্থক করে তুলবে, আর কিছু না হোক, যে বস্তি এলাকায় ছেলে-মেয়েদের দুঃখে শংকর দুঃখবোধ করেছিল, অন্তত সে অঞ্চলের লোকদের মনে শংকরের নামকে মতিমালা স্থায়ী করে যাবেই।

শংকরের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারটাকে মন থেকে মুহূর্তের জন্যেও মুছে ফেলতে না পারলেও মেয়ে-জামাই বা নাতি-নাত্নির ওপর মতিমালার স্নেহের টানে কোনদিনও একটু ভাটা পড়েনি, বরং সে স্নেহের গভীরতা দিন দিন আরো বেড়েই চলেছে। তাইতো ঘুম থেকে জেগে উঠে তাদের আসার কথাটা মনে পড়তেই চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মতিমালা।

আগের দিন সকাল থেকে ঝগড়া সুরু হয়েছে চন্দ্রনাথের সঙ্গে জুয়াখেলার জন্যে তাকে একটা টাকা দেওয়া নিয়ে আর তার জের চলেছে রাত দুপুর পর্যন্ত। কাজেই মতিমালা ভুলেই গিয়েছিল মেয়ে-জামাই-এর আসার কথা। কিছুই যোগাড়যন্ত্র নেই, লজ্জার কথা বৈ কি!

তাই তাড়াতাড়ি মতিমালা ডেকে তোলে চন্দ্রনাথকে। তার আবার সময় হয়ে গিয়েছে কাজে বেরুবার। উমেশবাবুর গিন্নীর যে মেজাজ, একটু দেরি হলে চিৎকার করে একেবারে পাড়া মাৎ করে তুলবেন। মতিমালা তাদের টালির চালের ওপর থেকে কয়েকটা লাউ আর কিছু লাউর ডগা কেটে আনতে এবং তার কিছুটা বিক্রি করে সে পয়সায় কিছু ভালো মাছ নিয়ে আসতে বলে যায় চন্দ্রনাথকে। গাছে পেঁপেগুলোও বেশ বড়ো হয়েছে। তা'দিয়েও একটা তরকারি তৈরি হতে পারবে।

এইভাবে ব্যবস্থা করে দিয়ে ঠিকে ঝি-র কাজে বেরিয়ে পড়ে মতিমালা। চন্দ্রনাথ সব কাজ এগিয়ে রাখে সেই ব্যবস্থা মতো। অন্য দিনের চেয়ে মতিমালাও অনেক আগেই চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি দু'বাড়ির কাজ শেষ করে দিয়ে।

দোকানে মালপত্র তেমন আর নেই বল্লেই চলে। তাই সেখানে যেয়ে বসে থাকা না থাকা সমান কথা। মাসের শেষে এমনি অবস্থাই দাঁড়ায় প্রত্যেকবার এবং মতিমালার মাইনের টাকা পেয়ে তা'দিয়ে কিছু কিছু জিনিষপত্র কিনে নতুন করে আবার দোকান সাজাতে হয় প্রতি মাসের প্রথম দিকে।

মাসের শেষ। দোকান একরকম খালি। তবু ঘরের কাজ শেষ করে দোকানেই যেয়ে বসে থাকে চন্দ্রনাথ। এতোদিনের অভ্যাস, না যেয়ে পারেনা দোকানে। সেখানে বসে বসে বিড়ি টানে। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে সময় সময় নানা রকমের গল্প করে সময় কাটায়। বস্তির ছেলেরা তাকে ডাকে চন্দ্রনাথদা বলে। তাতে খুবই খুশি হয় সে। উড়ে যাওয়া কাটা ঘুড়ি ধরে দিয়ে, কখনো কখনো হাতে হাতে এক আধটা লজেঞ্চুস দিয়ে চন্দ্রনাথও খুশি করে দেয় বস্তির ছেলেদের। লেখাপড়া শিখলে এসব ছেলেরাও তো বড়ো হতে পারতো বাবুদের বাড়ির সব ছেলেদেরই মতো। তার শংকরও তো তেমনি বড়ো হতেই চেয়েছিল।

মতিমালাকে উপদেশ দিলেও শংকরকে চন্দ্রনাথও ভুলতে পারে না। এক একটা দুর্বল মুহূর্তে তার অন্তরেও যেন দাউ দাউ করে স্মৃতির আগুন জ্বলে ওঠে। সে ভেবে পায়না ভুলে যাওয়াতেই শান্তি, না মনে রাখায়। মতিমালা যে কথাটা বলেছে তাই বোধহয় ঠিক। ভালো করে শংকরের স্মৃতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলে পরম তৃপ্তি লাভ হবে তাদের, তৃপ্ত হবে শংকরের আত্মা।

একা একা দোকানে বসে এমনি ধারা ভেবে চলে চন্দ্রনাথ। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ইন্দ্রনাথ দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে—

: দাদু, আমরা চলে এসেছি।

: বেশ করেছ, চলো দাদা ঘরে চলো। কোথায়, আমার দিদি কোথায়, তোমার মা-বাবা কোথায় ?

: ঐ যে !—চন্দ্রনাথের কোলে চড়ে নাতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মা-বাবাকে। তাদেরকে অনেকখানি পিছনে ফেলেই সে দৌড়ে চলে এসেছে। সেজন্যে তার কি কম অহংকার ? চন্দ্রনাথ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়ে-জামাই আর নাত্‌নির আশায়।

: এই যে এসো, এসো, এসো দিদি !—বলতে বলতেই সুন্দরী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রনাথের গায়ে। চন্দ্রনাথেরই দেওয়া নাম সুন্দরী, নাতির নাম রেখেছে সে ইন্দ্রনাথ—একেবারে দেবরাজ ইন্দ্রের অধিপতি।

চন্দ্রনাথ সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বেশ একটা সোরগোল পড়ে যায়। মতিমালার আদর আপ্যায়ন সুরু হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মুড়ির তো আর অভাব নেই মুড়িওয়ালির ঘরে ! উমেশবাবুর বাড়ির কাজ সেরে আসার সময় খানিকটা গুড়ও মতিমালা চেয়ে এনেছিল ঐ বাড়ির দিদিমণির কাছ থেকে। মুড়িগুড়ের ডালা দিয়ে ইতিমধ্যেই সে তার নাতি-নাত্‌নিকে বসিয়ে দিয়েছে ঘরের দাওয়ায়। রান্নার চালাঘরে মতিমালা গিয়ে বসে তার মেয়ে মায়ালতাকে সঙ্গে নিয়ে। জামাই সনাতন নানা প্রসঙ্গের আলোচনা সুরু করে শ্বশুরের সঙ্গে।

সোদপুরে একটা গেঞ্জির কলে কাজ করে সনাতন। মাসিক মাইনে ত্রিশটাকা আর তার সঙ্গে মাগ্‌গি ভাতা আরো বিশ টাকা। এই পঞ্চাশ টাকায় চার জনের সংসার মাসের অর্ধেকও চল্‌তে চায় না।

আগে বছরে দু'টো বোনাস ছিল, গত বছর থেকে তাও বন্ধ। মন্দার বাজার বলে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিও এবার বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে মালিক। এই অবস্থায় চোখে সরষে ফুল দেখছে সনাতন। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য সে পাবে, এই আশা সে করেছিল। শংকর মারা যাবার পর সে আশাকে নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিল তারা। কিন্তু কার্যত ধরাবাঁধা কোন সাহায্য পাবার লক্ষণতো সে এ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। মাসে অন্তত একবার করে সনাতন সবাইকে নিয়ে কোন না কোন রবিবার শ্বশুরবাড়ি আসে, দুঃখ-দুর্দশার কথাও বলে যায়। শাশুড়ি মাঝে মাঝে তার নাতি-নাতনিকে জামাটা প্যান্টটা, এটা সেটা কিনে দেয়, মেয়ে-জামাইকেও জামা-কাপড় দেয় সময় সময়। কিন্তু এসব সাহায্যে কোন উপকার হয় বলে মনে হয়না সনাতনের। তাই সে এবার মাসিক দশটা টাকার সাহায্যের কথা মুখ ফুটে বলে যাবে শ্বশুর-শাশুড়িকে ঠিক করেছিল। মায়ালতাকে সে কথাটাই সে বলেছিল ট্রেনে আসতে আসতে।

: ছিঃ, তুমি কেন জামাই হয়ে বলতে যাবে টাকার কথা! শ্বশুরের কাছে সাহায্য চাইতে তোমার লজ্জা করবে না?—সনাতনের কথায় ধমক দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মায়ালতা।

: বেশতো, তুমিই বরং তোমার মা-বাপকে বলে মাসে অন্তত দশটা করে টাকা আদায় করে দাও। দেখছোইতো আর চালাতে পারছি না। এখন আর লজ্জা, বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে!

: হ্যাঁ, আমিই যা হয় বলবো মাকে, তোমায় কিছু বলতে হবে না।—মায়ালতা আশ্বাস দেয় সনাতনকে এই বলে। তাই সব কথা বললেও শ্বশুরের কাছে টাকার কথাটা আর নিজের মুখে তোলে না।

বিকেলে সোদপুর ফিরে যাবার উদ্যোগ সুরু হয় সনাতনদের। ছেলেপুলের হুজ্জুত বড়ো হুজ্জুত, তাই মেয়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে রাত্রির খাওয়ার হাঙ্গামাটা শেষ করেই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে রওনা হবার কথা বলে মতিমালা।

তাই হয়। রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেনে মায়ালতারা চলে যায়। একটা লাউ আর কিছু পেঁপে মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দিতে ভুল করে না মতিমালা।

ছেলেটাকে রেখে যেতে বাপ-মায়ের মন ছ্যাত করে ওঠে। ছেলের কিন্তু খুব স্ফূর্তি! সে মামা-বাড়ি থাকবে, দাদু-দিদিমার আদর খাবে, স্ফূর্তি হবে না? সুন্দরীকে এবার সে জোর হারিয়েছে। ইন্দ্রনাথের সেও কি কম আনন্দের কথা!

মাসিক টাকা দেওয়ার চেয়ে ইন্দ্রনাথকে নিজের কাছে রেখে মতিমালা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেবে সে-ই বরং ভালো। মা-মেয়ের কথায় তাই স্থির হয় এবং সনাতনও তা মেনে নেয়। এক-জনের দায় থেকে তো সে মুক্তি পেলো, আপাতত তাই তার লাভ। ইন্দ্রনাথকে তারা রেখে যায় মতিমালার কাছে। ইন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ বছর, সুন্দরীর চার।

* * * *

আরো বছর দুই পরের কথা। হঠাৎ একদিন উমেশবাবুর বিধবা মেয়ের কাছে কথাটা পাড়ে মতিমালা।

ঃ আচ্ছা দিদিমণি, তুমিতো দেখি দিনরাত্তির লেখাপড়া নিয়ে থাকো তুমিইতো পারো একটা ইস্কুলের ভার নিতে। তা'হলেই কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় দিদিমণি!

ঃ তুমি কি বলতে চাও মতিমালা, খুলেই বলো না।—মতিমালার আসল বক্তব্য জানতে চায় সুলেখা।

: বলছিলাম কি, আমার শংকরের নামে আমি একটা ইস্কুল বসাতে চাই এই পাড়ায়। বস্তির গরীব ছেলেমেয়েরা পড়বে সেই ইস্কুলে। আমার শংকরের লেখাপড়ার কী আগ্রহই না ছিল! লেখাপড়া শিখে সে বড়ো হবে, গরীবের উপকার করবে এই ছিল তার সখ। কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবান তা আর হতে দিলেন না! আমার তাই ইচ্ছে, আমার শংকরের নামে আমি এমনি একটা ইস্কুল বসিয়ে যাই, যেখানে বস্তীর গরীব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড়ো হবার সুযোগ পাবে। সে ইস্কুলের ভার তুমিই নাও না দিদিমণি!

মতিমালার কথা একমনে অবাক হয়ে শোনে সুলেখা।

: একটা ইস্কুল বসাবার এতো টাকা তুমি কোথায় পাবে মতিমালা?

: এই ইস্কুল বসাবার জন্যেই তো পাঁচ বছর ধরে এতো মেহানৎ করছি, দিদিমণি! সকালে দু' বাড়িতে কাজ করে আবার বিকেলে রোজই বেরুই মুড়ি বিক্রি করতে। এ কি কম কথা, দিদিমনি? এ ইস্কুলটা যদি আমি দশজনের সাহায্যে করে যেতে পারি, তবেই আমার এতো পরিশ্রম সার্থক হবে, আমার সাধও পূর্ণ হবে। কথা দিন দিদিমণি, আপনি ভার নেবেন এ ইস্কুলের। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে, আপনি শুধু গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার ভার নেবেন।

: বেশ তো, আমি নেবো সেই দায়িত্ব। বাড়িতে তো বসে বসেই দিন কাটাই। এ তবু একটা ভালো কাজই করা হবে। তবে বাবাকে একবার বলে নিয়ে তোমায় পাকা কথা দেবো, বুঝলে। আচ্ছা মতিমালা, তুমি কতো টাকা জমিয়েছ এই ঠিকে কাজ করে আর মুড়ি বেচে? একটা ইস্কুল বসাতে যে অনেক টাকার দরকার! ততো টাকা আছে তোমার?

: হ্যাঁ, তা হবে। বেলগাছিয়া ডাকঘরে প্রায় ন'শ কি হাজার টাকার মতো জমে যাবার কথা এ্যাদ্দিনে।—একটু ভেবে নিয়ে সুলেখার প্রশ্নের উত্তর দেয় মতিমালা।

আরো কিছুদিন যায়। মতিমালার ইস্কুলের কথাটা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পাড়ার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তা হয়, আলোচনা চলে। অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না ব্যাপারটা, মনে করে এ নিছক বাত্‌কে বাত্‌। আবার অনেকে বিরোধিতাও করে।

সুলেখার কাছ থেকে সব কথা শুনে উমেশবাবু কিন্তু বিস্মিত হন যতোখানি, খুশিও হন তেমনি। এমন একটা ভালো কাজ যদি সামান্য একজন মুড়িওয়ালীর দ্বারা সম্ভব হয়, তা হলে তার চেয়ে মহত্তর দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? উমেশবাবু একথাটাই পাড়ার বিরুদ্ধ সমালোচক ও অবিশ্বাসীদের বুঝিয়ে আসছেন ক'দিন ধরে।

মতিমালার ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার নেবে সুলেখা, তাতে আপত্তির কী? একটু ভেবে নিয়ে সানন্দেই সেদিন কন্যাকে অনুমতি দিয়েছিলেন উমেশবাবু। সারাদিন বইপত্র নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার চেয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে দিন কাটাতে অনেক আনন্দ পাবে সুলেখা। লেখাপড়ার পরিবেশ সহরতলীর এ অংশটা সরগরমও হয়ে উঠবে, সেও কি কম করা?

এসব নানাদিক ভেবে উমেশবাবু নিজেই উঠে পড়ে লেগে যান মতিমালার ইস্কুল প্রতিষ্ঠায়। কর্পোরেশন থেকে জায়গাও একটু সংগ্রহ হয়ে যায় তাঁরই চেষ্টায়। চালাঘর তুলে দেয় বস্তির লোকেরাই উদ্যোগী হয়ে। বেঞ্চি আসে বার চৌদ্দখানা, আসে টেবিল চেয়ার। তার বহু কষ্টে অর্জিত অর্থের সদ্ব্যয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে মতিমালা।

তারপর একদিন বহু সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয়ে যায় পাইকপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শংকর শিক্ষায়তনের।

লেখাপড়ার একটা সাড়া পড়ে যায় সারা বস্তি এলাকায়। বিকেল বেলা জন ষাট সত্তর ছাত্র ছাত্রীর সুরকরে নামতা কড়াকিয়া পড়ার ধ্বনি শুনে বিচলিত হয়ে উঠে মতিমালা।

শংকর তো ঠিক এমনি সুর করেই নামতা পড়তো ছোটবেলা। সবার মতো ইন্দ্রনাথও ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই। শংকরও ঠিক তেমনই আসতো।

ইস্কুলের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে মতিমালা কেবল যেন তার শংকরকেই দেখতে পায়।

শংকর বুঝি ফিরে এসেছে বস্তির সব ছেলে মেয়েদের মধ্যে। আসবে না? সে যে লেখাপড়া শিখে বড় হবে, গরীবদের দুঃখ ঘোচাবে। তার সংকল্প পূর্ণ করার জন্ম তাকে আসতেই হবে।

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এমনি ধারাই ভাবে মতিমালা। তাতেই পায় সে পরম শান্তি। নিঃসন্তান বিধবা সুলেখাও বহু সন্তানের জননীর গৌরব বোধ করে তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে।

চন্দ্রনাথের দোকানের সামনে আগের চেয়ে অনেক বেশি ভিড় জমে শংকর শিক্ষায়তনের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। চন্দ্রনাথও যেন এদের মধ্যে খুঁজে পায় তার হারানো শংকরকে।

দুরাভিসার

মাথার বোঝাটা নামিয়ে রেখেই পয়সা নিয়ে সরে পড়ে কুলিটা। ট্রেন তখনো প্লাটফরমেই লাগেনি, ছাড়বার সময়ের তো অনেক বাকি।

স্টেশনে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করেই আসা হয়েছে। এতোটা আগে না এলেও চলতো। তা' হোক, একেবারে গাড়ি ছাড়ার মুখে দৌড়োদৌড়ি করার চেয়ে এই ভালো। তবে বড্ড যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল ওয়েটিং রুমটায়। সাত আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে যাও এক ভদ্রমহিলা বা ছিলেন, তিনিও কিছুক্ষণ না যেতেই আগের গাড়িতে চলে গেলেন বর্ধমানে।

ওয়েটিং রুমে সম্পূর্ণই একাকী তখন সুতপা সেন। একা চলাফেরায় বেশ অভ্যস্ত হলেও সেদিন সত্যি সত্যি যেন কেমনই লাগছিল তাঁর। রাত্রি বলেই হবে হয়তো। কিন্তু কলকাতায় অনেক রাতেও তো একা একা পথ চলতে হয় তাঁকে। কোনদিনই তো এমনি নিঃসঙ্গতা মনে হয়নি তাঁর। তা'ছাড়া এ হাওড়া স্টেশন। ওয়েটিং রুমের বাইরে প্লাটফরমে হাজার লোকের ছুটোছুটি। কাজেই ভয়ের কী থাকতে পারে ?

ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন সুতপা। ওয়েটিং রুমের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড়ো একটা গোল টেবিল। তারই একপাশের একটা ইজিচেয়ার অধিকার করে আছেন তিনি।

সামনে ও পিছনে দুই দেয়ালে টাঙানো বড়ো বড়ো দু'টি আয়না। উপর থেকে মাঝখানটায় ঝোলানো খুব বেশি পাওয়ারের একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব বাইরের সামান্য বাতাসে সর্বক্ষণই ক্ষীণ দোলায়মান। দু'টি আয়নাতেও ঐ আলোর ছায়া একইভাবে একটু একটু দু'লেই চলেছে। ইজি চেয়ার থেকে সামনের আয়নায় সেই আলোর দোলন লক্ষ্য করেন সুতপা। তাঁর মনে যে একটু নাড়া লেগেছে তাও এ থেকেই। তাই টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বেশ বড়ো করে খুলে ধরে পড়া সুরু করেন তিনি।

ছোট-বড়ো অনেকগুলো খবর পড়া শেষ করে সম্পাদকীয় পাঠে একটু মনোনিবেশ করতেই হঠাৎ ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই কার যেন পদচারণার শব্দ শুনতে পেলেন সুতপা। বিশেষভাবে পরিচিত সে পদশব্দ। গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়া আর সম্ভব নয় এর পর।

সবিস্ময়ে মুখের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা সরিয়ে নিতেই আরো আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় সুতপাকে। আরে, সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে গৌরীই চলে গেল না পিছন ফিরে, চোখের ওপর দিয়ে?

গৌরী কোত্থেকে আসবে হাওড়া স্টেশনে এসময়ে? তা'ছাড়া গৌরী হলে সুতপার সঙ্গে কথা না বলে কখনো যেতে পারে এভাবে? অবশ্য সুতপাকে যদি সে দেখতে পেয়ে থাকে তবেই উঠ্‌তে পারে সে কথা। কিন্তু নাইবা দেখতে পাবে কেন? এত বড়ো একটা হলঘরে একা বসে সুতপা। আর দ্বিতীয় কেউ এসে সে ঘরে ঢুকলে তার দিকে অন্তত একটিবার ও নজর না পড়ে যায় কখনো? তা' হতেই পারে না।—এমনি করেই এঁকে বেঁকে চলে সুতপার চিন্তাধারা। পথেঘাটে পড়ে থাকা সাপের খোলসের মতোই তা' অন্তঃসারশূন্য।

চোখেরই ধাঁধাঁ হবে হয়তো। তা'ছাড়া প্রায় আট বছর পর গৌরীকে এ বেশে এভাবে একা একা হাওড়া স্টেশনে চকিতে দেখার ঘটনাকে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে কোন রকম ব্যাখ্যাই করে উঠতে পারেন না সুতপা। তবে ধাঁধাঁই হোক আর যাই হোক গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে পটের ছবির মতো সুতপার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সমরেশের ছবি, গোয়ালিয়র প্রাসাদ, ফোর্ট এবং গোয়ালিয়র শহরের নানা বিচিত্র ছবি।

প্রায় আট বছর আগের ঘটনা। বিয়ের তিন বছর পর প্রথম যেবার ছুটিতে সমরেশের সঙ্গে গৌরীও বেড়াতে আসে কলকাতায় সেবার একরকম জোর করেই গৌরী সুতপাকেও নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে গোয়ালিয়রে ফেরার সময়। দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। গোয়ালিয়র তখন বৃটিশ-তাঁবেদার একটি দেশীয় রাজ্য। গোয়ালিয়রে বেড়াতে যেয়ে প্রথম প্রথম যতো আনন্দই হোক না কেন এ রাজ্যের অতীত ইতিহাস মর্মাহত করেছে সুতপা সেনকে। ঝাঁসির রাণী মহীয়সী লক্ষ্মী বাঈয়ের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে গোয়ালিয়র মহারাজার বিশ্বাস-ঘাতকতা, বীর নারী লক্ষ্মী বাঈয়ের প্রাণ হননের সুযোগ পেয়েছে বৃটিশ সৈন্য এই গোয়ালিয়রের মাটিতে একরূপ বিনা প্রতিরোধে, এ লজ্জার কাহিনী শুনে যে তিনি সেদিন শিউরে উঠেছিলেন সে কথাও মনে পড়ে যায় সুতপার। পুরুষ নারীকে তার যোগ্য সম্মান দিতে পারেনি কোন কালেই, এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূলই হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে। তবু পুরুষকে বাদ দিয়ে চলে না নারীর, এই হলো ট্রাজিডি। গোয়ালিয়রে লক্ষ্মী বাঈয়ের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আপন বুকের রক্তে অঞ্জলি দিয়ে অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছে হয়েছিল সুতপার। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই সেবার নিবৃত্ত হতে হয়েছিল তাঁকে।

একের পর এক কাহিনী ছবির মতো ভেসে ওঠে। সিনেমার ছবির

চেয়েও দ্রুত ভেসে আসতে থাকে তারা। ফোর্টে বেড়ানোর কথা একেবারে সুস্পষ্ট মনে পড়ে সুতপার। সমরেশ তাঁর নতুন গাড়ি নিয়ে ফোর্টে উঠতে ভরসা পাননি প্রথম। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে এ risk নেওয়া ঠিক নয়, এমনি মন্তব্যও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সুতপা তাঁর সে মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় তিনি শেষ পর্যন্ত গৌরী ও সুতপাকে নিয়ে 'জয় মা কালী' বলে start দিয়েছিলেন তাঁর গাড়িতে। বিপদ ঘটেনি কোন। তবে ফোর্টে গাড়ি নিয়ে ওঠার সময় এবং নামার সময়েও গৌরী ও সুতপা দুই বন্ধু যে বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারেন নি তা' তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন সমরেশের কাছে।

সে যাই হোক, গোয়ালিয়র ফোর্টের ওপরকার দৃশ্য ভুলবার নয়। গাড়ি ঠিক ওপরে যেয়ে উঠতেই একেবারে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন সুতপা। সমরেশ বাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদের দায় থেকে মুক্তি, সে কি সোজা ব্যাপার! দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল আর কি! গাড়িতেও পথ আর ফুরোয় না যেন, কেবলই উঠছে ওপরের দিকে তাই ওপরে উঠে সুউচ্চ মন্দির ঘেঁষে যেই এসে গড়িখানা দাঁড়ালো অমনি যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে এলো সবাইর। সমরেশও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। হবে না? গিন্নীর দায়িত্ব নয় নিজের, কিন্তু গৌরীর বন্ধু সুতপা তো পরের মেয়ে। কিছু একটা হলে কি আর উপায় ছিল, ঠিক এমনি ভাব সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন সুতপা সমরেশের চোখেমুখে।

ফোর্টের ওপর গোয়ালিয়র আর্ট কলেজ। অধ্যক্ষ তার একজন বাঙালী শিল্পী। কল্পনা-বিভোর শিল্পী ও তাঁর সদাহাস্যময়ী পত্নীর সাদর অভ্যর্থনার কথাও মনে পড়ে যায় সুতপার। ছাব্বিশ হাজার বর্গ মাইলব্যাপী সমগ্র গোয়ালিয়র রাজ্যের রূপ দৃষ্টির জালে ধরা পড়ে

ফোর্টের ওপর থেকে। সুদূর দেশীয় রাজ্যে প্রবাসী বাঙালী শিল্পী দম্পতি সেদিন তাঁদের কজন বাঙ্গালী দর্শককে পেয়ে কী খুশিই না হয়েছিলেন! তাঁরা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন তাঁদের সব কিছু। সমরেশ ও গৌরীর কিছুটা পরিচয় ছিল তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু সুতপা ছিলেন সম্পূর্ণই অপরিচিতা। তা' হলেও মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত অপরিচয়ের যবনিকা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

বসুন আর একটু, একটু চা খেয়ে যেতে হবে।—শিল্পীপত্নীর সেই মৃদুমধুর আমন্ত্রণ-ধ্বনি কানে বেজে ওঠে সুতপার। সুবিন্যস্ত শিল্পী-গৃহের পরিবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। তারপর মনোরম কলেজ-ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, ছায়া-সুশীতল ফোর্টের প্রাঙ্গণ। অতীতের অপূর্ব স্বপ্ন ঘিরে ফেলে সুতপাকে।

সমরেশ আর গৌরী। এদেরই জন্যে সুতপার সৌভাগ্য হয়েছিল কলেজ-জীবনেই দূরবর্তী একটি ঐতিহাসিক রাজ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের। এজন্যে কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই ওদের কথা স্মরণ করেন সুতপা। কিন্তু সেই আট বছর আগে গৌরী আর সমরেশের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ভাব লক্ষ্য করে এসেছেন তিনি, তা' মনে পড়লে সত্যি খুব দুঃখ পেতে হয়।

একটা নামকরা স্বদেশী বীমা কোম্পানীর ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমরেশ। বিয়ের দু'বছর আগে গোয়ালিয়র অফিসের ভার নিয়েছেন তিনি। তাঁরই সহকারী সান্যাল সাহেবের ঘটকালিতে অপরূপা সুন্দরী গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর।

সান্যালেরই নিকট-আত্মীয়া গৌরী। তাই বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। গৌরী-সমরেশের বিতর্ক-বিতণ্ডায় অনেক সময়ই মধ্যস্থতা করতে হয় তাঁকে। পূজোর ছুটির এক

মাস বেড়ানোর সময় সুতপাকেও সে কাজ করতে হয়েছে কয়েকবার। সুতপা কিন্তু প্রতিবারই সমরেশের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন, যদিও আড়ালে তিনি গৌরীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ওর কর্তার পক্ষ টেনে কথা বলার ব্যাপারটা সবটাই শো!

সমরেশ-গৌরীর গোলমালের মূলসূত্রটা কিন্তু নিতান্তই তুচ্ছ। টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়, সোনা-গয়নার তাগিদ বা শাড়ির সখ নয়, অপব্যয় বা অপচয়ের কথাও নয়। সামান্য একটা পোষা বেড়াল নিয়ে ঝগড়া, পারিবারিক অশান্তি।

আচ্ছা বল্ দেখি সুতপা, উনিতো সারা দিন আর রাতের অর্ধেক কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন ইন্সুরেন্সের কেস করে। আমি বেচারা বাড়ি থাকি কি নিয়ে? আমারও তো একটা সঙ্গী চাই। এই বেড়ালটাকে নিয়ে খানিকক্ষণও যদি আমার আমোদ-আহ্লাদে কাটে তাতে ওঁর আপত্তি করার কি থাকতে পারে, বল্ দেখি?

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে যায় সুতপার। তারপর একে একে বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন ব্যাপারই যেন মিছিল করে দেখা দিতে থাকে।

সুতপা গোয়ালিয়র থেকে চলে আসার দু'তিন দিন আগের কথা। সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসেছেন সবাই মিলে। মাঝখানটায় একখানা বড় প্লেটে মাখনমাখানো কয়েক পিস্ টোষ্ট আর অন্য একখানা প্লেটে খান কয়েক সরভাজা। এক পিস্ টোষ্ট তুলে নিয়ে খাওয়া সুরু করতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বলে ওঠেন সমরেশ—আরে ঐ দেখুন মিস্ সেন, আপনার বন্ধু-কন্যার জ্বালায় কি আর চা-টুকও শান্তিতে খাবার জো আছে!

এও যেই বলা, অমনি একেবারে দপ করে জ্বলে ওঠেন গৌরী দেবী। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

মেরেই ফেলনা শুভাকে, তোমার যদি এতোই জ্বালা হয়ে থাকে ওর জন্যে। চা না বিষ! আমি আর এ বাড়ির চা ভুল করেও ছোঁব না।—এই বলে চায়ের কাপ টেবিলের ওপর ঠেলে রেখে সেই যে গৌরী দেবী গিয়ে শুয়ে পড়লেন সুতপা অনেক সাধ্য-সাধনা করেও আর উঠিয়ে আনতে পারলেন না তাঁকে।

তোরই তো দোষ গৌরী। সে বেচারা তোর সঙ্গে একটু ঠাট্টা তামাসাও করতে পারবে না, এ কেমন কথা। এমনি হলে তোরা সংসার করবি কি করে?—সুতপা এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করেন গৌরীকে। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো।

যা না, তোর যদি এতোই পছন্দ হয়ে থাকে সে বেচারাকে, তুই-ই যেয়ে সংসার করগে তাঁর সঙ্গে।—তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে গৌরী দেবী একেবারে এমনি কড়া কথা শুনিয়ে দেন সুতপাকে।

সে কি বড় সুখের হবে তোর কাছে? সইতে পারবি তুই?

গৌরী পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। আর একটি কথাও মুখ ফুটে বেরোয় না তাঁর।

সুতপাও ঝড়ের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করে আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যান সেদিনের মতো।

বেড়ালটাই যতো নষ্টের গোড়া, যতো অশান্তির মূল। কিন্তু কী-ই বা উপায়। গৌরী তো সন্তানের চেয়েও বেশি আদরে পুষছে এই বেড়ালকে। তার নাম রেখেছে শুভা। খাওয়া, শোওয়া, বসায় শুভা গৌরীর চোখে চোখে। এতোও পারে, বাবা! ভাবতে ভাবতে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সুতপা।

কিন্তু সব দিক ভেবেও সুতপার এ কথাই ঠিক বলে মনে হয়েছে যে, নাম শুভাই হোক আর যাই হোক এই বেড়ালের জন্যেই

যখন গৌরীর সংসারে যতো গোলমালের আমদানী তখন বেড়ালটাকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। যাবার আগে সমরেশকে একথাটা বলতেই হবে, এও স্থির করে নিয়েছিলেন সুতপা সেন। অবশ্যি শেষ পর্যন্ত আর কথাটা তোলবার সুযোগই হয়নি সমরেশের কাছে। মাত্র তো আর দু'দিনের দেখাশুনো, তাই গৌরী দেবী সর্বক্ষণই রয়েছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে।

অভিমানভরে একটা দিন প্রায় অনাহারে কাটিয়ে দেবার পর মনটা যেন অনেকটা পাত্‌লা হয়ে এসেছিল গৌরী দেবীর। সুতপার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও মোটামুটি বেশ সহজ হয়েই আসছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে তাঁর সংসার তিনি একেবারেই নীরব। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতোই নিস্তব্ধ। সুতপার মোটেই ভাল লাগেনি সে অবস্থা। তাই তাঁরই আগ্রহে ঠিক হলো, রবিবারের ম্যাটিনি শো-টা দেখা হবে তিনজনে মিলে।

পরদিনই চলে যাবেন সুতপা। কাজেই তার অনুরোধ উপেক্ষা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি—গৌরীরও নয়, সমরেশেরও নয়। যথাসময়ে তিনখানা টিকিটও নিয়ে এসেছে সমরেশের আরদালি।

ওরা দুই বন্ধু তখন মত্ত ছিলেন সাজগোজ নিয়ে।

আর যে মাত্র বার মিনিট বাকি শো আরম্ভ হতে। এবার চলুন সুতপা দেবী।—ডাক আসে সমরেশের ঘর থেকে।

: এই যে আস্‌ছি, হয়ে গেছে আমাদের।—এই বলে ড্রয়িং রুমের চৌকাট পেরিয়ে মাত্র বেরিয়েছেন সুতপা অমনি ধপাস করে এক শব্দ। পেছন ফিরে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ে, জিভ্‌ কাটছেন গৌরী দেবী।

: কি হলো ? কিসের শব্দ ? পড়ে গেলি বুঝি ?

: আরে না, আমার আর যাওয়া হবে না। তোরাই ঘুরে আয়

সুতপা। এই দেখছিস্ না, কী ব্যাপার!—এই বলে গৌরী তাঁর পরণের বেনারসী শাড়ির আঁচলটা ধরে দেখান বন্ধুকে যে, কিভাবে তাঁর শুভা হঠাৎ গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় এক হাতের মতো কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে।

: তা' হোক গে, সিনেমায় যেতেই হবে তোকে।

: কী করে যাই, বল্। দেখছিস্ না, এখনো কেমন করে শুভা আটকে রেখেছে আমায়?

সত্যি সত্যি তখনো পর্যন্ত বেড়ালটা গৌরীর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল তাঁর স্যাণ্ডেলটা টেনে ধরে।

: এতোও পারিস বাবা!—গৌরীর এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকটা বিরক্তির সঙ্গেই এ মন্তব্য করেন সুতপা।

: আরে আর কতো দেরি করবে তোমরা? যেতে যেতে শো তো আরম্ভই হয়ে যাবে।—এবার গৌরীকে লক্ষ্য করেই ডাকেন সমরেশ।

: এই শোন। তোমরাই যাও আজ সিনেমায়। এই ছাখো না, কতোটা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে শুভা। কিছুতেই আমায় আজ যেতে দেবে না।

: বারে, তোমার টিকেট আনা হলো আর তুমি যাবে না?

: তাতে কি হয়েছে, পরেশকে নিয়ে যাও না তোমাদের সঙ্গে!

শেষ পর্যন্ত তাই হলো পরেশ আরদালিকে নিয়েই ওরা গেলেন গোয়ালিয়র টকীজে। গৌরীর না যাওয়ায় সুতপা বা সমরেশের দিক থেকে তেমন জোর আপত্তি উঠলো না দু'কারণে। প্রথমত, সমরেশ আর গৌরীর মানভঞ্জনের জন্যেই সুতপার এই সিনেমা দেখার আয়োজন। শুভাই যখন সে কাজ করে দিয়েছে তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে? দ্বিতীয়ত, সুতপা চলে যাবার আগে

তাঁকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যদি একটু একা পাওয়া যেতো তা' হলে যেন খুবই ভালো হতো, আগের দিন থেকে কেবল এই মনে হচ্ছিল সমরেশের। শুধু সমরেশেরই বা হবে কেন, সুতপারও তাই। তবে পরেশ আরদালি সঙ্গে থাকায় তাঁদের উভয়েরই মন খুলে কথা বলার একটু অসুবিধা হয়েছিল বৈকি ?

সে যাই হোক, গৌরী দেবী ঘরে থেকে যাওয়ায় অনেক কাজ এগিয়ে রইলো সুতপার। তা নইলে সিনেমা থেকে ফিরে তাঁকেই হয়তো সব গুছিয়ে নিতে হতো একা হাতে। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে গৌরীর কি আর সময় হতো ? কাল ঘুম থেকে উঠেই তো কলকাতা যাওয়ার হাঙ্গামা।

আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের চিন্তায় সে সময় কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মন তা আবার নতুন করে মনে পড়ে সুতপার। শুধু গৌরীর জন্যে নয়, সমরেশের জন্যেও তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল বার বার। সত্যি সত্যি বড্ড নিরীহ লোক সমরেশবাবু। রাতদিন এই হাড়ভাঙা খাটুনিতেও কোন ক্লান্তি নেই ভদ্রলোকের। তারপর ঘরে ফিরেও গৌরীর মুখঝামটা তো আছেই কথায় কথায়। তবুও বিরক্তি নেই এতোটুকু। এসব দেখেশুনে সুতপার কেমন যেন একটা মায়াও হয়ে গিয়েছিল সমরেশের জন্যে। তাই তাঁর কেবল মনে হতো, গৌরী আর সমরেশের মন কষাকষির যদি একটা স্থায়ী নিষ্পত্তি হয়ে যেতো তিনি থাকতে থাকতে, তা'হলে বড়োই ভালো হতো। সিনেমায় যাওয়া উপলক্ষ করে কিছুটা বুঝাপড়া যে অন্তত হয়েছে, সুতপা তাতে খুবই আনন্দিত।

ঃ সুতপা, ছাড়াছাড়ি হবার আগের রাতটা আয় আমরা গল্প করেই কাটিয়ে দি দু'জনে। ছোটবেলা কতো রাত এভাবে কাটিয়েছি, বলতো ?

ঃ দূর পাগলি! সমরেশবাবু একা পড়ে থাকবেন এক-ঘরে আর আমরা রাতভর গল্প করব, কি চমৎকার তোর ব্যবস্থা!—গৌরী দেবীর প্রস্তাব নাকচ করে দিতে চান সুতপা, কিন্তু টেকে না তাঁর যুক্তি।

ঃ বারে, কতোরাত ওর একা একা ফাইলপত্র নিয়ে কেটে যায় তুই কী করে জানবি তার খবর? এ নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবেনা। বল্‌ছি, উনি কিছুই মনে করবেন না এজন্যে। সত্যি সুতপা, তুই চলে যাবি, এখন থেকেই আমার যেন কেমন লাগছে। কাল থেকে আবার তো যে মরুভূমি সে মরুভূমিই হয়ে দাঁড়াবে এ সংসার।

ঃ কেনরে তুই এসব কথা বলছিস গৌরী? সমরেশ বাবুর মতো লোক হয় কোন? দেবতার মতো মানুষ, তাঁকে নিয়ে কোন হাঙ্গামাই তো হবার কথা নয় তোর। আমার কি মনে হয় জানিস্, মানুষের যার যতোটুকু অশান্তি সে নিজেই সেটুকু সৃষ্টি করে নেয় নিজের জন্যে। তা' নইলে তোদের দু'জনের সংসারে গোলমালই বা আসে কোত্থেকে আর মরুভূমিই বা মনে হবে কেন? তারপর তো আবার তোর শুভাও রয়েছে।

ঃ আরে ভাই, এই শুভাকে নিয়েই তো যতো গোলমাল।

ঃ তাই যদি হয়ে থাকে, শুভাকে বিদায় করে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। বুঝতে পারছি, মা হবার সখ মেটেনি বলেই তোর এই বেড়াল পোষা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হচ্ছে। কিন্তু ভাই, একটা মেয়ে থাকলেও তো তাকে তোর বিয়ে দিতে হতো। এও না হয় শুভাকে কোথাও পার করে দিয়ে সব হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলি? তাই কি ভালো না? আর এও তোর ভাবা উচিত, ভদ্রলোক যা পছন্দ করেন না তেমন ঝক্‌মারির মধ্যে তোর থাকা ঠিক নয়। কি বলিস্?

এই বলে গৌরীর দিকে তাকাতেই সুতপা দেখতে পান যে, দর দর

ধারায় জল পড়ছে তাঁর দু'চোখ বেয়ে আর অকারণেই তিনি একটা বইয়ের পাতার পর পাতা ওল্টাচ্ছেন টেবিলের ওপর।

এদিকে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সুতপার দু'চারটে কথা শুনতে পেয়েছেন সমরেশ এবং তা শুনে ঠিক একই সময়ে একটু মৃদু মন্তব্য করে ফেলেন তিনি।

: খুব জোর গবেষণা করেছেন বটে, মিস্ সেন, কিন্তু সাব্জেক্টটা বড্ড টেক্নিক্যাল। তবে সারা রাতটাই তো আপনার হাতে রয়েছে। দেখুন কি দাঁড়ায়।

দুই বন্ধুরই কানে যায় সমরেশের কথাগুলো। গৌরী ভাবেন, সুতপার এই পরামর্শের পেছনে সমরেশেরও যুক্তি রয়েছে হয়তো। তা' নইলে সুতপার কথার সঙ্গে সমরেশের সুরের এতোটা মিল ঘটছে কি করে? আবার সুতপা ভাবছেন, সাব্জেক্টটা টেকনিক্যাল যতোটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি সেন্টিমেন্টাল। তাই ড্রাষ্টিক কিছু করা মুস্কিল। তবে, গৌরী যখন নীরব নির্বাক, তখন খুব কষ্টের সঙ্গে হলেও হয়তো তিনি তাঁর পরামর্শের বারো আনাই মেনে নিয়ে থাকবেন, এই তাঁর ধারণা। খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে বাকিটা যে কথায় কথায় কন্‌ভিন্স করা যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই সুতপার।

: চল্ গৌরী, খাওয়ার হাঙ্গামাটা সেরে আসি। রাত কম হয়নি কিন্তু!

ক্রমে রাত্রির আকাশে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। গোয়ালিয়র—রাজের প্রাসাদ-প্রহরী আর দুর্গ-প্রহরীরা ছাড়া রাজ্যের আর প্রায় সবাই তখন ঘুমিয়ে। আর যারা ঘুমোয়নি তাদের মধ্যে গৌরী এবং সুতপার নামও করা যেতে পারে।

কথায় কথায় তরুণ-তরুণীর রাতভোর করা নয়, দুই বান্ধবীর গল্পে

গল্পে কখন যে পূর্বাকাশে উষার আলোকরেখার উন্মেষ ঘটেছে গৌরী বা সুতপা কারুরই তা খেয়াল হয়নি। সুতপার কোন সাড়া না পেয়ে ভোরের কাক-ডাকার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠেন গৌরী দেবী। সর্বনাশ! একেবারে রাত শেষ! আচ্ছা, ঘুমাক সুতপা—এই বলে বিছানা ছেড়ে সটান রান্নাঘরে চলে যান গৌরী। শুভাও তখন ঐ বিছানারই একধারে পায়ের তলার দিকে ঘুমোচ্ছিল।

সুতপার ট্রেন আটটায়। দুঘণ্টার মধ্যে তার রান্না শেষ করে আবার রাস্তার খাবারও তৈরী করতে হবে। চোখেমুখে যেন পথ খুঁজে পান না গৌরী দেবী। কোনটায় তেল পড়ে তো, নুন পড়ে না। আবার কোন তরকারীতে হয়তো মশলা দিতেই ভুল হয়ে যায়। এমনি তাঁর অবস্থা। তবু ভাগ্যি পরেশটা এরই মধ্যে লুচি বেলা শেষ করে স্টোভটা ধরাতে সুরু করেছে। কাজেই যা'হোক কোন রকমে সব কিছুই সময়মতো হয়ে যাবে এই তাঁর ধারণা।

এদিকে ঘড়িতে এলার্ম পড়তেই একলাফে বসে পড়েন সুতপা তখনো সেখানে ঘুমোচ্ছিলো শুভা।

: বাঃ, বেশ লোকতো তুই গৌরী! তুই নিজে উঠে এলি চুপি চুপি আর আমায় একটু ডেকে দিলি না। বলি, কে যাবে, তুই না আমি? —একটু পরেই এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে সুতপা প্রশ্ন করেন গৌরীকে।

: বারে, তুই যাবি বলেই তো তোর যাবার সব আয়োজন করে দিতে হবে আমাকে! সময়মতো তোর ঘুম ভাঙলেই হলো। তার জন্যেই তো ঘড়িতে এর্লাম দেওয়া। আগে থেকে তোকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি লাভ?—উত্তর আসে গৌরীদেবীর তরফ থেকে।

যথা সময়ে গৌরী আর সমরেশ যেয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসেন সুতপাকে।

দীর্ঘ দিনের অসাক্ষাতের যবনিকা পড়ে তাঁদের মধ্যে।

*　　*　　*　　*

আট বছর পর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে হঠাৎ স্বপ্নের মতো গৌরীর ছায়া নজরে পড়তেই তাঁর গোয়ালিয়র বাসের পুরো কাহিনী এমনি করে মনে পড়ে যায় সুতপার। ইতিমধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে ওয়েটিংরুম যাত্রী সমাগমে। সুতপা দেবীর খেয়ালই ছিল না কোন কিছুর।

হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টা পড়ে। চিন্তার নেই কিছু। তাঁর স্লিপিং একোমোডেশন রিজার্ভ করাই আছে সেকেণ্ড ক্লাসে। ঠিক সময়েই সুতপা এসে তাঁর জায়গা ঠিক করে নেন গাড়িতে।

তিনজনের আর একটি পরিবার বাকি সিট কয়টি অধিকার করে বসেছিলেন। তাতে বেশ ভালোই হয়েছে সুতপার। রাত্রির জার্নি। অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সহযাত্রী পরিবারভুক্ত পাঁচছয় বছরের ছেলেটিই কিন্তু প্রথম এসে যেচে আলাপ সুরু করেছে সুতপার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তাঁকে দু' দু'বার করে এসে জোর করে চকোলেটও দিয়ে গেছে। তারপর আর বাকি দুজনের সঙ্গে আলাপ না জমে পারে কখনো ?

ঃ শংকর, এই শংকর শোনো একটা কথা।—সুতপা যতোই ডাকেন ওকে শংকর ততোই তার মায়ের কোলে মাথাটা চেপে রেখে লুকিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে শংকরের অনেক আগেই। কিন্তু চলমান ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে তার মনও ছুটে চলেছে জাগরণের উদ্দাম উল্লাসে। ঘুম নয়, ঘুমের ভানও নয়। বিষম লজ্জায় পড়েছে শংকর। কথা শোনার জন্যে নয়, তাঁর

খাবারের একটা অংশ নেবার জন্যেই যে ডাকছেন তাকে স্থতপা এ সে বেশ বুঝতে পেরেছে। তাই সে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে মা'র কোলে।

ঃ ছিঃ, যাও না শংকর। মাসীমা এতো করে ডাকছেন বার বার, একবারটি শুনে এসো যেয়ে।—স্থতপা আর একবার শংকরকে ডাকতেই শংকরের মা তাকে কোল থেকে টেনে তুলে পাঠিয়ে দেন স্থতপার কাছে।

মাথা নীচু করে কাচুমাচু হয়ে এগিয়ে যায় শংকর। স্থতপা দেবী তাকে কাছে টেনে নিয়ে একখানি সন্দেশ তার হাতে দিতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। সন্দেশ নিয়েই ছুটে এসে মায়ের কোলে মুখ ঢেকে আবার সে লুকোতে চায় নিজেকে। মা এবার তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দেন তার বিছানায়। সন্দেশ হাতে করেই ঘুমিয়ে পড়ে শংকর।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন এর মধ্যে।

পুরী এক্স্প্রেস। নিশীথ নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে বিপুল বিক্রমে এগিয়ে চলেছে ট্রেন ঘনান্ধকার ভেদ করে। লক্ষ্য নীলাচল। নীলাচল মহাতীর্থ আর কতদূর? কতদূর আর সেই মহামিলন ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র?

ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মধ্যেও দোলা লাগে স্থতপা দেবীর মনে। তাঁর অধ্যাপক স্বামীও হয়তো তাঁরই কথা ভাবছেন ঘুমের ঘোরে। পুরী স্টেশনে তিনি হয়তো এসে উপস্থিত হবেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই। পুরী স্টেশন আর কতদূর?—ঘুমের মধ্যেই ভাবছেন এসব স্থতপা দেবী।

দেখতে দেখতে কটক স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। তার আগে আরো অনেকগুলো স্টেশনেই গাড়ি এমনি থেমেছে, কিন্তু স্থতপা

বা তাঁর ট্রেন-সঙ্গীরা তার কোন হদিসই রাখেন নি বা রাখার দরকার মনে করেন নি। শংকরের বাপ-মা অনেক কালের বাসিন্দা কটকের। তাঁদের জানা-ই আছে, গাড়ি এসে কটক স্টেশনে লাগবে ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে। তাঁরাও সময় মতোই তৈরী হয়ে আছেন নেমে যাবার জন্যে। সুতপাকে তাঁরাই ডেকে তুলেছেন যাবার আগে। মেয়েছেলে, একলা একটা কামরায় ঘুমিয়ে থাকবেন, তা' ঠিক নয়। শংকরের মা তাই সজাগ করে দিয়ে যান তাঁকে বিদায় নেবার আগে। ওরা চলে যাবার সময় শংকরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েই থাকেন সুতপা। ভারি মিষ্টি ছেলেটি!

সত্যি, কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে ওঠে সুতপার একলা কামরায়। একজন যাত্রীও উঠলেন না তাঁর কামরায় কটক স্টেশন থেকে! বিস্ময় লাগে তাঁর। আবার এও তিনি ভাবেন, একা কোন পুরুষ যাত্রী আসার চেয়ে এই ভালো। কে জানে, কখন কার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে।

কটক থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার মুখে একখানা মাসিক পত্রিকা কিনে নেন সুতপা স্টেশন থেকে। নির্জন বাকি পথের জন্যে চাইতো একটা কিছু!

মানুষের জীবনে অতীতের অকার্ষণও বড়ো কম নয়। পিছনের পথ, পিছনের পরিচয় টেনে রাখতে চায় মনকে অনেক সময় মনের অজ্ঞাতেই। মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে চলেছেন সুতপা। একের পর এক গল্প শেষ করছেন, শেষ হচ্ছে এক একটি প্রবন্ধ বা কবিতা পড়া। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায় পথের দেখা শংকর ছেলেটিকে। ওরই মতো একটি ছেলে তো অনায়াসেই থাকতে পারতো গৌরীর। তাহলে কী শান্তির সংসারই না হতো ওদের।

শুধু গৌরীর কথাই বা কেন? সুতপার নিজেরও তো আজ নিতান্তই প্রয়োজন এমনি একটি ছেলে বা মেয়ের। কতটুকুই বা সময় এই ট্রেনে একা একা থাকতে হচ্ছে তাঁকে, তাতেই যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠছেন তিনি। আর পুরীতে নির্জন গৃহবাসে কতই না জানি কষ্ট হবে তাঁর। শাশ্বত সন্তান-তৃষ্ণা তীব্রভাবে জেগে ওঠে সুতপার অন্তরে। সুতপা তখন সন্তানসম্ভবা। অলক্ষেই তাই তাঁর দুই ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি চলে যায় সুতপার। সবুজ বনানী ঘেরা দূর পল্লীর আকাশ ছাড়িয়ে চোখে পড়ে কয়েকটি মন্দিরের চূড়া। তার মধ্যে একটি প্রধান। কোথাকার মন্দির এসব, কোন্ দেবতার? প্রশ্ন জাগে সুতপার মনে। কিন্তু জিজ্ঞেস করার কেউ নেই কাছাকাছি।

পুরোদমে ছুটে চলেছিল ট্রেন। হঠাৎ যেন স্তিমিত হয়ে আসে তার গতি। গাড়ি সম্পূর্ণ না থামতেই হুড়মুড় করে এক ধরণের লোক উঠে পড়ে কামরায় কামরায়।

ঃ কী চাও তুমি?—সুতপার ভয়চকিত জিজ্ঞাসায় থমকে দাঁড়ায় আগন্তুক।

ঃ আমি পাণ্ডা অছি মা। ভয় কিছু নেই আপনার। চলুন, বাবার দর্শণ চাই, চলুন আমার সঙ্গে। কোন কষ্ট হবে না।

ধুতি-চাদর পরিহিত বলিষ্ঠদেহী ঐ বামন আগন্তুকের নির্ভয়তার আশ্বাসে ভয় আরো বেড়ে যায় সুতপার।

ঃ কি, পুরী এসে গেলুম নাকি এত সকালে?

ঃ না মা, এ পুরী নয়, ভুবনেশ্বর মহাতীর্থ আছে। ঐ দেখুন না

ভুবনেশ্বর মহাদেবের মন্দির। বাবার দর্শনে সমস্ত মনস্তাপ ঘুচে যাবে, সমস্ত আশা পূর্ণ হবে। চলুন আমার সঙ্গে।

ঃ না, আমি ভুবনেশ্বরে যাবো না তো, পুরী যাবো।—এই বলে সুতপা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকাল আর একবার জানালার ফাঁক দিয়ে।

পূর্বে আর কখনো উড়িষ্যায় না এলেও সুতপার পরিচয় আছে এ রাজ্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে। পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনারক মন্দির-ভাস্কর্য সম্বন্ধে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। তিনি ইতিহাসের ছাত্রী।

সুতপা পুরী যাবেন শুনে পাণ্ডা আর তাঁর কামরায় অনর্থক কালক্ষেপ না করে হাতের খাতার ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দিয়ে যায় আর যাবার সময় বলে যায়, 'পুরীতে পৌছে এই গোবর্ধন ঠাকুরের খোঁজ করবেন মা, গোবর্ধন পাণ্ডাকে পেলে আর কোন অসুবিধা হবে না আপনার জগন্নাথ দরশনে'।

পাণ্ডাদের এই ধরণের ব্যবসা ও উৎপাতের কথা সুতপা কিছু কিছু শুনেছিলেন কলকাতা থাকতেই, এবার তা' প্রত্যক্ষ করলেন। কামরার উঠে তো বটেই, যে সব যাত্রী বা যাত্রীনী নেমে পড়েছেন ট্রেন থেকে তাঁদেরও কি সহজে এগুবার জো আছে এই পাণ্ডাদের জ্বালায়। সুতপা এসবই লক্ষ্য করেছিলেন ট্রেন থেকে আর ভাবছিলেন বাকী পথটাও এই একা একাই যেতে হবে। ঐ যে ঐ বেঁটে পাণ্ডাঠাকুর তাঁর কামরা থেকে নেমে যেয়েই এক ভদ্র মহিলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, অথচ তাঁর সঙ্গের যাত্রী ভদ্রলোক এগিয়ে চলে গেছেন অনেকখানি অখেয়ালে। সুতপার ইচ্ছে হয়, ট্রেন থেকে নেমে পাণ্ডাঠাকুরকে দু'টো কড়া কথা শুনিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে আসে ভদ্রমহিলাকে।

এরই মধ্যে হঠাৎ এক প্রৌঢ় বয়সের যাত্রী এসে ওঠেন স্থতপার কামরায়। তাঁর হাতে মাঝারি গোছের একটা স্থটকেশ। আর কোন মালপত্র নেই তাঁর সঙ্গে, অপর কোন সঙ্গীও নয়।

ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই খুব পরিচিত বলে মনে হয় তাঁকে স্থতপার। পরিচয়ে এতই ঘনিষ্ট যে, বিশেষ একটি নাম স্থতপার। একেবারে দু'ঠোঁটের ডগায় এসে চাপা পড়ে আছে সামান্ত একটু সন্দেহে। স্থটকেশটার উপর তাকাতেই সে সন্দেহ শূন্তে মিলিয়ে যায় ধোঁয়ার মত।

: আরে সমরেশ বাবু এখানে কোথেকে? কোথায় চলেছেন? থাকেনই বা কোথায় আজকাল?

পরিচিত কণ্ঠে একটানা এতগুলো প্রশ্ন হতবম্ব হয়ে পড়েন সমরেশ। স্তব্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁকে হাতের স্থটকেশ নামিয়ে রেখে।

: কে আপনি স্থতপা দেবী না? আগেকার মিস্ সেন, এখন মিসেস Something কি বলেন? বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটতেই পাল্টা প্রশ্ন করেন সমরেশ।

: ঠিক বলেছেন সমরেশ বাবু, ভালই হলো। উঃ এমনি করে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। বস্থন বস্থন!

: তা' বসছি। কিন্তু আপনি একা একা একেবারে পুরীর পথে, তার মানে?

: তার মানে পরে শুনবেন। আগে বলুন আপনারা কোথায় আছেন?

: আমরা কেথায় আছি, এ উত্তর দেওয়া মুস্কিল স্থতপা দেবী। তবে আমি বছর আড়াই হলো ভুবনেশ্বরে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি।

এখানে একটা নতুন আফিস খুলেছি। তা' নিয়েই দিন রাত কেটে যাচ্ছে।

পুরনো দিনের ব্যথার একটা সুর মর্মরিত হয়ে ওঠে যেন সমরেশের কথায়। গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কটা আরো তিক্ত হয়ে উঠেছে বোধ হয়। সন্দেহ হয় সুতপার। তাঁর এত চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ তা' বলে। মনের সংশয় চেপে রেখে বল্‌তে সুরু করেন তিনি—

ঃ গৌরী ওর মা'র কাছে গেছে বুঝি? ও এলেই কিন্তু আমাকে জানাবেন। আর আপনি তো পুরীই চলেছেন এখন। চলুন, আমাদের বাড়িতেই উঠবেন। বেশ আমোদ হবে। তা' ছাড়া ওর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে। বড্ড লোক ভালবাসেন আমার কর্তা। খুবই খুশি হবেন আপনাকে পেয়ে।

ঃ তাই নাকি! বেশ তো, নিশ্চয়ই যাব তা' হলে। তবে এবার নয়। পরে কোন এক সময় আগে থেকে ব্যবস্থা করেই আসা যাবে।—সুতপা দেবীর আমন্ত্রণের উত্তরে সমরেশ চেপে যেতে চান গৌরীর কথা।

ঃ এই নিন, রেখে দিন আমাদের পুরীর ঠিকানাটা তা' হলে। এই বলে এটাচি কেসটা খুলেই নোটবই থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সুতপা নিজেই লিখে দেন তাঁদের নতুন ঠিকানা আর বেশ জোরের সঙ্গেই আর একবার অনুরোধ জানান সমরেশবাবুকে তাঁদের পুরীর বাড়িতে যাবার জন্যে।

ঃ সে তো হলো, এবার আপনার প্রসঙ্গ বলুন কিছু। নতুন পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন কদ্দিন ধরে, ভদ্রলোকই কি খুঁজে বার করলেন আপনাকে না আপনি আবিষ্কার করলেন তাঁকে, সে সব রহস্য বলুন, শুনি। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বলেইতো জানার আগ্রহ।

তা' না হলে কি আর এমনি খোঁজ খবরের সুযোগ হতো কখনো ?

: বারে, বেশ পাল্টা অভিযোগ করছেন তো আপনি। আমি চিঠি লিখে লিখে হয়রান। কোন্ জবাব-পত্র নেই। আর উল্টো কথা শোনানো হচ্ছে আমাকে ? গোয়ালিয়র থেকে কলকাতা ফিরেই সেবার আপনাদের দুজনকেই চিঠি দিয়েছি। উত্তর না পেয়ে ফের পত্র দিয়েও জবাব না পাওয়ায় ধরেই নিয়েছি যে আপনারা হয়ত বিরক্ত হয়েছেন আমার উপর কোন না কোন কারণে। তাই অনেকদিন পর্যন্ত আর কোন চিঠিপত্রই দি-ই নি আপনাদের। কিন্তু দু'বছর আগে অধ্যাপক দাশগুপ্তের সঙ্গে বিয়ের কথা যখন ঠিক হলো আমার তখন আর কি চুপ থাকা চলে অভিমান করে ? আমার বিয়েতে গৌরী উপস্থিত থাকবে না এতো ভাবতেই পারিনি কোনদিন। কিন্তু তাই হলো। আপনারা এলেন তো নাই, এমন কি দু' লাইনের একটা চিঠিতে একটু শুভেচ্ছাও এলো না আপনাদের কাছ থেকে !

সমরেশ বাবু গম্ভীর ভাবে শুনে যান সুতপা দেবীর কথা। কী যেন উত্তর দেবেন ভেবেই যেন পান না কিছু। কেমন একটা অধৈর্য অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে। তবু যেন অনেকটা জোর করেই নীরব থাকেন তিনি।

গাড়ি চল্ছে। গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে সুতপা দেবীও বলে চলেছেন—

: জানেন সমরেশ বাবু, অধ্যাপক দাশগুপ্ত গৌরীরও খুবই পরিচিত। আমাদের-জীবনে আমরা দু'জনেই পড়েছি তাঁর কাছে। এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ছিলেন তিনি আমাদের স্কুলে। তারপর মাষ্টারি করতে

করতেই ভদ্রলোক ইংরেজীর এম্-এ হয়েও আবার ইতিহাসের এম্-এ পরীক্ষা দিয়ে brilliant result করে কলকাতার একটা নতুন কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। আমিও সে কলেজ থেকেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছি। এই দিন বার আগে পুরী কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে join করেছেন তিনি। আমারও একটা চাকুরী জুটে গেছে পুরী গার্লস স্কুলে। তাই সেখানেই যাচ্ছি। বলুন তো, গৌরী থাকলে কী-ই না আনন্দ হতো বিয়েতে !

: তা' হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু কী করেই বা জানবে গৌরী আর কী করেই বা সে উপস্থিত থাকবে আপনার বিয়েতে ?—নীরবতা ভেঙ্গে উত্তর দেন সমরেশ বাবু।

: কেন ?

: আর কেন! গৌরী কি আর আপনার চিঠি পেয়েছে কোন ? সে তো প্রায় আপনার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়েছে গোয়ালিয়র থেকে।

: সে কি ?—আঁৎকে ওঠেন সুতপা দেবী এই কথা শুনে।

: আমার উপর রাগ করে চলে যাবার আগে আমার জন্যে এটুকুই শুধু সে লিখে রেখে গেছে, "তোমার মত প্রাণহীন নিষ্ঠুরের সঙ্গে আমার জীবনকে আর বেঁধে রাখা চলে না। তোমার সংসার রইল। আমি চললাম শুভার খোঁজে।"

: কী সাংঘাতিক কথা! সেই থেকে একদম নিখোঁজ গৌরী ?—সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে সুতপার এটুকু প্রশ্ন করতে। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে আর কোন কথা বলতে।

: পাঁচ বছর ধরে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করি নি তাকে খুঁজে বার করার। কিন্তু তাতেও যখন কোন সন্ধানই পাওয়া গেলনা তখন

চুপ করে গেলাম। আপনার কাছেও একবার খোঁজ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ন'-দশ মাস পর হঠাৎ আপনার দ্বিতীয় পত্রখানা পেয়েই বুঝলাম আপনিও কোন সন্ধান রাখেন না গৌরীর। পৃথিবীর কেউ আর তার খবর রাখে, এ বিশ্বাস আমি হারিয়েছি গোয়ালিয়র থাকতেই। তারপর চলে এসেছি এই ভুবনেশ্বরে। প্রতি রোববার যাই পুরী-তীর্থে। সেখানে সীমাহীন সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে আমি ধ্যান করি সেই অসীমের যে অসীমের কোলেই হয়ত যেয়ে গৌরী শেষ আশ্রয় নিয়ে থাকবে আমার নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে। আমিই নাকি তার শুভার হত্যাকারী!

: একি বলছেন সমরেশ বাবু? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতে হচ্ছে এভাবে? আমিই যে গোয়ালিয়র থেকে বিদায় নেবার দিন ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুভাকে একা পেয়ে তাকে জানালার ভিতর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম ড্রেনের দিকে। ভেবেছিলাম, আপনাদের পারিবারিক জীবনের সব অশান্তি দূর হয়ে গেল সেই সঙ্গে। তার ফল হলো এই!

সুতপা এই বলে উঠে পড়েন তাঁর আসন ছেড়ে। সমরেশ বাবুর পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে এক বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। সমরেশ খোলা জানলায় তাঁর দু'হাতের উপর মাথা রেখে গৌরীর কথা ভাবতে ভাবতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তখন। টেনে তোলেন তাঁকে সুতপা দেবী। নীরব কান্নায় অশ্রুসজল চোখে নিস্পন্দ বসে থাকেন সমরেশ। নিরালা এক চলন্ত ট্রেনের কামরায় সে দৃশ্য অসহ্য মনে হয় সুতপার। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল ব্যথার কালিমায় ছেয়ে যায়। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে

থাকে তাঁর দু'চোখ বেয়ে। ট্রেনের কামরার জানালার পাশে হেলান দিয়ে সুতপাও নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে পুরী এক্স্প্রেস। লক্ষ্য নীলাচল। আর বেশি দূর নয়। অসীমের আহ্বান ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।

নাম ?

শ্রীহনুমান চৌবে।

চার রূপিয়া।............

দু' নম্বর আসামী লোকনাথ রাউৎ হাজির ?

খুব নিকট হইতেই কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ায় এক গোবেচারা মানুষ। মুখে একগাল পান। গায়ে একটা হাতাকাটা ফতুয়া। চুলে তেলের পরিমাণ এত বেশী যে লোকটিকে বাঙ্গালী বলিয়া ভুল করিবার কারণ নাই। চোখেমুখে যেন একটা গুরুতর অপরাধের ছাপ।

নাম ?

লোকনাথ রাউৎ।

বাড়ি ?

বালেশ্বর জেলা।

তিন টাকা।

হুজুর, আপন মতে ক্ষেমা দিয়ন্তু। মু আউ কৌদিন রাস্তায় পিশাপ করিব না। মু গরীব লোকমতে ছাড়ি দিয়ন্তু। মু টঙ্কা দেই পারিব নাহি, বাবু।

নিকালো হিয়াঁসে।

পেশ্‌কারবাবুর মুখের কথা সবটা বাহির হইতে না হইতেই আসামীর কাঠগড়ার প্রবেশমুখে দাঁড়ানো লালপাগড়ির লোকটির লোকনাথের ডান হাত ধরিয়া এমন এক হ্যাঁচকা টান মারে যে, বেচারা

পায়ের তাল ঠিক রাখিতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায়। সে দিকে কারুর ভ্রুক্ষেপ নাই কোন। বিচারপর্ব যথারীতি অতি দ্রুত-গতিতেই আগাইয়া চলিয়াছে।

সাঁইত্রিশ নম্বর আসামী নীলাম্বর ধোবী হাজির?

এই যে স্যার।—এক পাশ হইতে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর আসে।

কালোমত বেঁটে বাঙ্গালী। ব্যবসায়ে ধোবী। দুইচারি অক্ষর ইংরাজীও বলিতে কহিতে হয় তাহাকে—সাহেব-সুবাদের, বড় বড় অফিসারবাবুদের কাজ বুঝিয়া নিতে হয়, আবার বুঝাইয়া দিতে হয় তাহার। কাজেই এক-আধটুকু ইংরাজী না বুঝিলে ও বুঝাইতে না পারিলে চলিবে কেন?

কিন্তু ইংরাজী জানিলে এবং 'স্যার' বলিয়া সম্মান-সম্বোধন করিলে কি হইবে—কাঠগড়ায় যাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই পেশ্‌কারের দিক হইতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবাণ আসে এমন সুকঠোর ভাষায় যে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যায়, এমন কি 'গুডমর্নিং' বলিবারও ফুরসুৎ পায় না; অথচ সারাক্ষণ ধরিয়া শুধু এই কথাই সে ভাবিয়া আসিতেছিল যে, রাজভাষার সাহায্যেই সে বাজীমাৎ করিতে এবং সসম্মানে খালাস হইয়া আসিতে পারিবে।

নাম?

নীলাম্বর।—থতমত খাইয়া কোন রকমে জবাব দেয় আসামী।

আধমরা গাধাটাকে কেন মারলে ওরকম করে?

মারিনি তো, স্যার!

দশ টাকা।

আসামী কিছু বলিতে উদ্যত হইলেই কড়া নির্দেশ আসে পেশ্‌কারের আসন হইতে—

যাও!

তাহার উপর আবার পুলিশের চোখ রাঙানি। নীলাম্বর চতুর ব্যক্তি। বেগতিক বুঝিয়া সে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া কাঠগড়া হইতে বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া পড়ে। সহরতলীর লোক হইলেও সহুরে লোকদের মেজাজ নীলাম্বর ভাল করিয়াই জানে। কারণ সহরের সঙ্গে যোগাযোগ তো তাহার ঘনিষ্ঠই। তবে দশ টাকা, বড্ড বেশী!

বড় বিদ্বান বেটা আমার! হাকিমের মুখের উপর কথা।—রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক বৃদ্ধ গর্জন করিয়া উঠে ভিড়ের মধ্য হইতে।

পাশের লোকজন তাহাকে বসাইয়া দেয় হাত টানিয়া। কিন্তু 'শিক্ষিত' পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া অলক্ষ্যে বৃদ্ধ পিতার তিরস্কারবর্ষণ নিবৃত্ত হয় না।

গোরু-গাধা মেরে কে করে দু'তিন টাকার বেশি খেসারৎ দিয়েছে, শুনি? তিনি গেলেন ওস্তাদি করে ইংরেজি বিদ্যে ফলাতে। নাও এবার বোঝ ঠ্যালা, ফেল দশ টাকা!

চুপ, চুপ চুপ!—বুড়োকে থামাইয়া দেয় সকলে মিলিয়া। কিন্তু উত্তেজনা তাহার তবুও প্রশমিত হয় না।

ইতিমধ্যে আরও দুইটি মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তবে নীলাম্বরের পিতা আদালত কক্ষে যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল অনেকে তাহাতেই মশ্‌গুল ছিল, বিচার বা বিচার-প্রহসনের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না।

বছর-পঁচিশ আগের কথা। রোজকার মত সেদিনও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য। আসামীদের ভীড়ে ঘাড় ঘুরাইয়া কথা বলাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আদালতে সকলের দৃষ্টি প্রধানত আকৃষ্ট রহিয়াছে দুইজনের

দিকে—সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হাকিম অর্থাৎ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এবং একটু নীচে বৃহত্তম টেবিলের সম্মুখে পেশ্‌কার মহাশয়ের প্রতি। দ্বিতীয়ত আর যাহারা আদালতে উপস্থিত কাহারও চোখ এড়ায় না তাহারা হইল বিচারালয়ের তিনটি 'ষ্ট্রাটিজিক পয়েন্টে' দণ্ডায়মান তিনজন লালপাগড়ি কনেষ্টবল।

হাকিম মহোদয় অনেকটা নৈবেদ্যের উপরকার চিনির মণ্ডার মত। লম্বা ছিপছিপে ভদ্রলোক বিজ্ঞজনের মত চুপচাপ তাঁহার উচ্চাসনে বসিয়া আছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ সাহেবী। আদব-কায়দা সাহেবদের ব্যর্থ অনুকরণ। এক-একবার বুকপকেট হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া কারণে বা অকারণে লম্বা ফুলস্কেপ কাগজের উপর কি যে লিখিয়া যাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে পেশ্‌কারের সংগে কি যে কথা বলিতেছেন তিনিই জানেন।

বিচারকার্যে ব্যস্ততা যাহা কিছু পেশ্‌কার মহাশয়ের। পেশ্‌কারের প্রতাপে সবাই সন্ত্রস্ত। আসামীদের নম্বর ধরিয়া ডাকেনও তিনি, হাকিমের হইয়া সরাসরি রায়ও দেন তিনিই। মুহূর্ত মাত্র সময়ও নষ্ট করিবার উপায় নাই তাঁহার। প্রতি দুই মিনিটে এক-একটি মামলার নিষ্পত্তি না করিলেই নয়। দৈনিক আড়াই শত হইতে তিনশত 'কেস' করিতে হয় তাঁহাকে। বেশি 'কেস' থাকিলে আরো তাড়া পড়ে। কারণ পরের দিনের জন্য কোন 'কেস' ফেলিয়া রাখিলে দায় বাড়িয়াই চলিবে। সে ভয়ও বড় কম নয়। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট আয়ের জন্য দৈনিক নির্দিষ্টসংখ্যক মামলার ফয়সলা করিতে না পারিলে জরিমানার অঙ্ক বাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা পেশ্‌কারের পছন্দ নয়, কারণ বেশি জরিমানার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার মনে মাঝে মাঝে আশঙ্কাও উঁকিঝুঁকি মারে। তবে যেদিন 'কেস' নিতান্তই কম থাকে

সেদিন দণ্ডের মাত্রা কিছু কিছু না বাড়াইয়া পারেন না 'দণ্ডপাণি' পেশ্‌কার মহাশয়। কারণ, তাঁহা না হইলে বাঁধা আয় আসিবে কোথা হইতে? হিসাবে ভুল হইবার জোটি নাই?

বাহান্ন নম্বর আসামী মোহন মিঞা হাজির?

পিছন হইতে অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে আগাইয়া আসে একজন নিরীহ গ্রাম্য মুসলমান।

নাম?

মোহন মিঞা।

পিতার নাম?

কাদির মিঞা।

পাঁচ টাকা।

মোহন কাঁদিয়া ফেলে রায় শুনিয়া। তবে কি বাপের নাম বলিয়া অন্যায় করিল সে! তাহার একটা কথাও শুনিলেন না হাকিম! কিন্তু কে কাহার আফ্‌সোসের ধার ধারে? তাহার চোখের জল কনেষ্টবলের শুষ্ক-মরুমনে কিঞ্চিৎ দয়া বা সহানুভূতিরও সঞ্চার করিবে এরূপ আশা করাও যে নিতান্ত দুরাশা, মোহন মিঞার তাহা জানা থাকার কথা নয়। তাই পশ্চাতে দণ্ডায়মান পুলিশপুঙ্গবের আচমকা টান ও ঘাড়ে ধরিয়া বাহিরের দিকে যথারীতি ধাক্কায় তাহার মোহভঙ্গ হইল বটে, তবে শাসন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের এই ব্যবহারে তাহার বিস্ময় ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না।

নিত্যকার মত গড়িয়া গ্রাম হইতে সব্‌জি লইয়া আসিতেছিল মোহন শিয়ালদহের বাজারে। সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গোরুর গাড়ির তলাকার লণ্ঠনটার আলো সে জ্বালাইয়া লইয়াছিল সন্ধ্যা হইবার আগেই। মোহন আইনজ্ঞ না হইলেও এইটুকু আইন তাহার ভাল

করিয়াই জানা আছে যে, সহরে সূর্যাস্তের পর আলো ছাড়া গাড়ি চালানো চলে না। এই তথ্য জানার জন্ত তাহাকে কোন বহি-কেতাবও পড়িতে হয় নাই বা কাহারও নিকট হইতে কোন পাঠও লইতে হয় নাই। আপনা হইতে এই অমূল্য জ্ঞান সে কবে কিভাবে শুধু আহরণই করিয়া লয় নাই, বিশেষভাবে আয়ত্তও করিয়া লইয়াছে। কাজেই আইনভঙ্গের অপরাধ না হয় সে সম্পর্কে স্বাভাবিক সতর্কতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না তাহার দিক হইতে। অথচ নসিবের দোষে কোথা হইতে অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া কখন যে গাড়ির বাতিটা নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে, মোহন তাহার কোন কিছুই জানে না। একটু আগেও সে একবার ঘাড় কাত করিয়া দেখিয়া লইয়াছে যে লণ্ঠনের আলো ঠিকমত জলিতেছে কিনা। দেখিয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। শিয়ালদহের বাজার আর দুই তিন মিনিটের পথ। এইটুকু সময়ের মধ্যে আবার কোন হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে এমন সন্দেহ মোহনের ধারণারও বাইরে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে অকস্মাৎ একটা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া যে বিপদ বাধাইয়া দিয়া গিয়াছে, মোহন তাহার কোন হদিস না পাইলেও তাহা কিন্তু পুলিশের চোখ এড়ায় নাই। পুলিশও ঝড়ের বেগে আসিয়া মোহনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। নাম ঠিকানা আর গাড়ির লাইসেন্স-নম্বর নোটবইয়ে টুকিয়া লইয়া সে-রাত্রির জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও মোহনের উপর পুলিশের নির্দেশ, পরদিনই তাহাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে।

পুলিশের সেই হুকুম তামিল করিতেই সে আদালতে আসিয়াছিল। কিন্তু আদালতে তাহাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তবে বিচারের যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিল সেখানে, তাহা আর জীবনে

ভুল হইবার নয়। সব খরচ-খরচা বাদ দিয়া সব্‌জি বিক্রয় করিয়া পুরা দুই টাকাও সে লাভ করিতে পারে নাই। অথচ বিনাদোষে কোর্টে তাহাকে আক্কেল সেলামী দিয়া যাইতে হইল পুরাপুরি তিন টাকা! মোহনের পক্ষে ইহা সত্যই মর্মান্তিক।

বিচারের এই সব গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আদালত গৃহের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক বড়ই ছট্‌ফট্‌ সুরু করিয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোকটি যে একজন বিশিষ্ট মানী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্ট ব্যবহার ও অনাড়ম্বর সাজসজ্জা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি দেখিয়া আশ-পাশের সকলেই অবাক হইয়া ভাবে যে, কী এমন ব্যাপার যাহার জন্য ভদ্রলোক এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। মানীর অপমান বজ্রাঘাততুল্য। বিচারে কেহই যেখানে খালাস পাইতেছে না সেই আদালতে তিনি আসামী, এই তাঁহার ভাবনা।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকিলেও তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না বলিয়াই কেহই বড়ই একটা উকীল নিয়োগ করে না অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে, ভদ্রলোকের তাহা জানাই ছিল। তবে বিচারের যে নমুনা তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ করিলেন সে অভিজ্ঞতা তাঁহার সম্পূর্ণ নতুন। কাজেই একজন উকীলের আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন তিনি এই বিষয়ে এবং একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই 'গাছতলায় বসা' উকীলের সন্ধান করিতে যিনি কোর্টের ফটক হইতেই তাঁহাদের পিছন লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের অনিবার্য ফল সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহে করিবার জন্য চেষ্টার আর কিছু বাকি রাখেন নাই। সেই উকীল

বেচারার এমনই বিকট চেহারা যে, তাঁহার দ্বারা যে কোন মামলা পরিচালনার কাজ চলিতে পারে, ভদ্রলোক তখন তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কয়েকজন আসিয়া লম্বা সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছে যে, আইনের মারপ্যাঁচ তাঁহার মত বুঝিতে পারে এমন উকীল নাকি এই আদালতে আর নাই। ভদ্রলোক জানিতেন না যে, সার্টিফিকেট-দাতারা সবাই সেই উকীলেরই টাউট, বখ্‌শিসের উপরে দিন চলে তাহাদের, উকীলদের 'কেস' জোগাড় করিয়া দেয় তাহারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদ্য পরিচিত উকীলটি আসিয়া উপস্থিত। হাসিয় স্বকীয়তায় নিকটস্থ সকলকে চমকাইয়া দিয়া তিনি বলেন সেই ভদ্রলোককে—

কি মশাই, প্রথমেই বলেছিলাম না যে, নাস্তি গতিরন্যথা? তখন তো গায়ে মাখেন নি আমার কথা। এখানকার হালচাল দেখে এতক্ষণে টনক নড়ল বুঝি? অথচ আগে থেকে আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিলে কত কাজ এগিয়ে যেতো বলুন তো! যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে। এখন শুনুন কথা।

বলুন।

একটু পিছনে মুখ ফিরাইয়া উকীলবাবু আবার বলেন—

অনেক কাজ মশাই। এই আমার মুহুরী সখারাম। একে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। দিন্ তো একে একটা টাকা। হ্যাঁ দরখাস্তের কাগজ আনতে হবে এক্ষুণি। তার জন্যেও আরো আট আনা দিয়ে দিন, আর এক প্যাকেট সিগারেটের পয়সা।

এই নিন।—বলিয়া ভদ্রলোক দুইটি টাকাই বাহির করিয়া দেন সখারামের হাতে।

সখারাম হাত পাতিয়া টাকা লইলে হইবে কি, প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখেন উকীলবাবু কর গুনিয়া গুনিয়া।

ছাখো, সখারাম, পাও তো 'গোল্ডফ্লেক' আনবে—বাজে সিগারেট আনবে না। আজেবাজে জিনিষ আমি বরদাস্ত করতে পারিনে, বাবা!—প্রকারান্তরে ইহা যে সখারামের উপর সিগারেটের জন্য 'বাজে' পয়সা খরচ না করারই নির্দেশ তাহা একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই বুঝিল না বটে, তবে উকীলবাবুর পরবর্তী কথাবার্তা ও আচরণে বুদ্ধিমান লোকের মনে একটা কিছু সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া কোর্টের ফটকে তাঁহাকে প্রথমে তো সানন্দে বিড়ি ফুঁকিতেই দেখা গিয়াছিল!

সখারাম বাহির হইয়া যাইতে না যাইতেই উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার মক্কেলকে—

কি মশাই, সিগারেট ফিগারেট আছে কিছু?

না, পানদোষ তো নেই আমার। আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। এই যে জীবানী, তুমি তো কম্পিটিশনে ধূমপান করো। দাও না একটা সিগারেট উকীলবাবুকে।

জীবানীতোষ ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার অন্যতম সঙ্গী হিসাবে আসিয়াছেন আদালতে। বন্ধুর কথায় তাড়াতাড়ি পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বাক্স বাহির করিয়া দেন উকীলকে।

উকীলবাবু ধন্যবাদ জানাইয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আবার প্রশ্ন করেন মক্কেলকে—

আচ্ছা, মশাইয়ের নামটা তো জানা হলো না!

শ্রীহিমাংশু সেন। আপনার নাম?

শ্রীনিশাপতি ভট্চায বি এল। তবে এ অঞ্চলে নিশাপতি বলেই

পরিচিত। এক ডাকেই চেনে সবাই। 'পেটি কেসে'র ঝঞ্ঝাট অনেক মশাই। সাহস করে আর কোন উকীলই এ সব 'কেস' বড় একটা নিতে চায় না। তাই সবাই ডাকে এই নিশাপতিকে। —নাস্তি গতিরন্যথা !

আপনি তো কেবল নিজের কথাই বলছেন, নিশাপতিবাবু। আমার কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সারুন। একশ' বাহাত্তর নম্বর আমার। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশটি নাম বাকি। যে রকম বাদ দিয়ে দিয়ে নম্বর ডাকা হচ্ছে, তাতে আর কতটুকু সময় পাওয়া যাবে ?

না, না মশাই, সে ভয় কিছু করতে হবে না আপনাকে। এখন আর কোন নম্বর বাদ পড়বে না, নম্বর বাদ পড়ে আগের দিকেই। প্রথমদিকে অনেকেরই কোর্টে হাজির হতে অসুবিধে হয়। তাদের অনেকেই শেষ অঙ্কে এসে উপস্থিত হবে। সবই টাকার খেলা। কাজেই সে বিষয়ে ভাবনা নেই আপনার। ঐ যে সখারাম কাগজ-পত্র নিয়ে আসছে। দিন্ দেখি দু'টো টাকা—আমি এ ফাঁকে আসল কাজটা সেরে আসি।

দুইটি টাকা লইয়া নিশাপতি বাতাসের বেগে কোথায় গেলেন এবং চক্ষের নিমেষে কোথা হইতে কি কাজ সারিয়া আসিলেন তিনিই জানেন। আসিয়াই সখারামের হাত হইতে ফাইলটা টানিয়া লইয়া হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে করিয়া বারান্দায় আসিলেন এবং সখারামকে বলিয়া দিলেন নাম ডাকের দিকে কান রাখিতে।

বারান্দায় লম্বা বেঞ্চির উপর বসিয়া ফাইল খুলিয়া নিশাপতি জিজ্ঞাসা করেন হিমাংশুবাবুকে ঘটনার বিবরণটা এবং পকেট হইতে একটা পেন্সিল বাহির করিয়া অতি দ্রুত লিখিয়া চলেন এক দরখাস্ত। কিন্তু লেখার দৌড় অৰ্দ্ধ মিনিটের মধ্যেই থামিয়া যায়।

হ্যাঁ, বলে জান ব্যাপারটা।

দুই-চারি অক্ষর লিখিয়া নিশাপতি আবার জিজ্ঞাসা করেন সেই একই প্রশ্ন।

দু'বার করেই তো শুনলেন ঘটনার বিবরণ, আবার নতুন করে কি বলব, বলুন তো? এদিকে যে সময় শেষ হয়ে এলো। যা হয় তাড়াতাড়ি লিখে নিয়ে চলুন ভিতরে।

মক্কেলের বিরক্তি দেখিয়া নিশাপতি আবেদনপত্রে কোন রকমে আর কয়েকটি লাইন লিখিয়া বলেন—

এই নিন, দিন্ এখানে একটা সই, আর আমার ফি-টা।

হিমাংশুবাবু দরখাস্তখানা হাতে লইয়া খানিকটা পড়িয়াই তাতে সই দিতে আপত্তি জানাইয়া বলেন উকীলবাবুকে যে, আবেদনের লেখা এমনই ত্রুটি ও ভ্রান্তিপূর্ণ যে তাহা হাকিমের নিকট পেশ করা চলে না।

কি বলেন মশাই! আজ বার বছর কেটে গেল এখানে এ কাজ করে। আর আপনি শেখাবেন আমাকে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা অ-ঠিক? কোন্ হাকিম কি ধরণের ইংরেজী ভাল বুঝবে তা' আপনি জানবেন কি করে? অমাদের জানা আছে সে সব। এর চেয়ে ভাল ইংরেজি লিখলে এ হাকিম বুঝতেই পারবে না কিছু। আপনারই 'কেস' খারাপ হয়ে যাবে।

উকীলের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক নির্বাক হইয়া যান একেবারে। কোন রকমে আত্ম-পরিচয়সহ একটা স্বাক্ষর দেন দরখাস্তের তলায়।

আমার ফি-টা?

কত?

দিন্ চার টাকা। আপনার কাছে আর বেশী চাইব না। তবে

খালাস করে আনতে পারলে যদি খুশি হয়ে কিছু দেন তো দেবেন। আর খালাস করতে পারবোইবা না কেন? ভাড়া ঘোড়ার গাড়ির পিছনে নম্বরের চাকৃতি আছে কি না আছে, সেতো আর আপনার জানার কথা নয়। সে দায়িত্ব গাড়োয়ানের। আপনি কি করবেন তার? এ সামান্য কথাটা হাকিমকে বুঝাতে না পারলে ওকালতি ব্যবসাই ছেড়ে দেবো!

এই কথা বলিতে বলিতে নিশাপতি তাঁহার মক্কেলের সইটা ঠিক আছে কিনা তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য তাঁহার চশমা-আঁটা নাকের ডগার সামনে দরখাস্তখানা তুলিয়া ধরিয়া চাপা গলায় একেবারে চ্যাঁচাইয়া উঠেন—

আঃ, আপনি দৈনিক 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদক! আগে সে কথা বলেননি কেন মশাই? তা'হলে দরখাস্তের ভাষায় আর একটু জোর দেওয়া যেতো! যাক্‌গে মুখেই সব ঠিক করে দেবো। কোথায়, আমার টাকাটা?

এই যে নিন্।

এদিকে সখারাম দরজার বাইরে গলা বাড়াইয়া দিয়া ডাকিতেছে—

এবার অস্থন স্যার। আর মাত্র দু'টো নম্বর বাকি।

নিশাপতি হাত পাতিয়া টাকা লইয়া পকেটস্থ করিতে ব্যস্ত। মুখ ঘুরাইয়া সখারামের দিকে চাহিবারও সময় নাই তাঁহার। তবে কান ছিল তাঁহার সখারামের দিকেই। টাকাটা পকেটে গুঁজিয়া ফাইল বগলদাবা করিয়া নিশাপতি "আসুন, আসুন" বলিতে বলিতে ত্বরিতপদে ঢুকিয়া পড়েন আদালতগৃহে। হিমাংশুবাবু অনুসরণ করেন তাঁহাকে। মিনিট-দুইতিনের মধ্যেই ডাক পড়ে তাঁহার।

একশ' বাহাত্তর নম্বর আসামী হিমাংশু সেন হাজির?

নিশাপতি উকীল হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হন বিচারকের দিকে। আসামীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই দাঁড়ান হিমাংশুবাবু। হাকিম-পেশ্‌কার সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এই নিরীহ ভদ্রলোকের দিকে। ভয়ে আতঙ্কে রীতিমত কম্পমান তিনি। কি রায় হয় না হয় এই আশঙ্কা।

নিশাপতি যথারীতি পেশ্‌কারের নিকট পেশ করেন দরখাস্তখানা। দরখাস্তের স্বাক্ষরে আসামীর পরিচয় দেখিয়া পেশ্‌কার একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন হিমাংশুবাবুর দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করেন—

নাম?

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেন।

প্রশ্নের উত্তর দিতে শুষ্ক ও নিস্তেজ কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠে হিমাংশু বাবুর। ইহার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন, না রায়?—এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তোলপাড় করিয়া তোলে তাঁহার মনকে। পেশ্‌কার নির্বিকারভাবে ঘোষণা করেন—

W. D.

হিমাংশুবাবু ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্যহীনভাবে তাকাইয়া থাকেন কিছুক্ষণ।

'—নেমে আসুন, নেমে আসুন' বলে নিশাপতি হাসিমুখে ডাকিতেই তাঁহার মনের ভয় অনেকটা কাটিয়া যায়। তিনি বারান্দায় চলিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন যেন।

কী ব্যাপার উকীলবাবু, ডব্লিউ-ডিটা কি আবার, বলুন তো!

আরে মশাই, বলেছিনা আপনাকে খালাস করে আনবোই; তা না হলে ওকালতি ব্যবসাই ছেড়ে দেবো! ঠিক ছেড়ে দিতাম—যদি না পারতাম আপনাকে ছাড়িয়ে আনতে। বামুনের প্রতিজ্ঞা মশাই,

কথার নড়চড় হবার উপায়টি নেই। এখন আপনার বিচারে যা' হয় করুন।

ভদ্রলোক এতক্ষণে মোটামুটি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপারটা ভালয় ভালয়ই মিটিয়া গিয়াছে। খুশি হইয়া হিমাংশুবাবু তাঁহার মনিব্যাগ হইতে আর একটা টাকা বাহির করিয়া দেন নিশাপাতিকে এবং চলিয়া যাবার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—

আচ্ছা উকীলবাবু, 'ডব্লিউ-ডি'টা কি তা তো বল্লেন না!

আরে মশাই, অতবড় একটা নামকরা কাগজের সম্পাদক আপনি, তাও জানেন না? W. D. মানে 'Warned' and 'Dicharged'. বুঝতে পারলেন এবার?

আচ্ছা নমস্কার।

নমস্কার। ভবিষ্যতে দরকার পড়লে ভুলবেন না যেন স্মরণ করতে। উকীল বলতে নিশাপতি! নাস্তি গতিরন্যথা!

নিশ্চয়!